জুন ২০২৬ ■ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩৩

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

হাম (Measles):
আপনার যা জানা প্রয়োজন

World Health Organization
Bangladesh

হাম একটি খুব সহজে ছড়ানো ভাইরাসজনিত রোগ, যা মূলত শিশুদের বেশি হয়। যেসব শিশু টিকা নেয়নি বা সম্পূর্ণ টিকা পায়নি, তাদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়। হামের থেকে সুরক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ২ ডোজ সম্পূর্ণ টিকা গ্রহণ করা।

হামের লক্ষণ ও উপসর্গ:

- সারা শরীরে র‍্যাশ: প্রথমে মুখে শুরু হয়, পরে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ৫-৬ দিন থাকে।
- উচ্চ জ্বর
- নাক দিয়ে পানি পড়া
- কাশি
- চোখ লাল হওয়া ও পানি পড়া
- মুখের ভিতরে ছোট সাদা দাগ

আপনার শিশুকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন:

- ৯ মাস ও ১৫ মাসে দেওয়া এমআর (হাম-রুবেলা) টিকার ২ ডোজ সম্পূর্ণ করুন।
- নিয়মিত সব টিকা সময়মতো দিন
- আসন্ন এমআর টিকাদান ক্যাম্পেইনে অংশ নিন
- সন্দেহভাজন (জ্বর ও র‍্যাশ থাকা) রোগীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন
- লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিন

কারও হাম হলে কী করবেন:

- দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা নিন
- আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন
- শিশুকে আলাদা রাখুন (স্কুল, ভিড় বা খেলার জায়গায় যাওয়া বন্ধ রাখুন)

কোথায় সাহায্য বা তথ্য পাবেন:

- নিকটস্থ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী (হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট)

©World Health Organization Bangladesh

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুন ২০২৬ ❑ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩৩

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৬ই জুন ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তৃতা করেন- পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মো. ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
৮৩০০৬৮৭
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

মানব সভ্যতার বিকাশ ও অস্তিত্বের জন্য পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ জরুরি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিবেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে পরিবেশের বৈচিত্র্যকে নষ্ট করছে। যথেচ্ছ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করায় পরিবেশ ও জলবায়ুর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, বৃক্ষ নিধন ও গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে পরিবেশ সুরক্ষায়। পরিবেশ সংরক্ষণ একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা যা ব্যক্তি, সমাজ ও সরকার– সকলের অংশগ্রহণে সফল হতে পারে। পরিবেশ রক্ষায় আমরা প্রত্যেকে পরিবেশবান্ধব চিন্তা-চেতনা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ হই। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সরকার সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে। সরকার নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড এবং ইমাম, পুরোহিত ও মুয়াজ্জিনদের জন্য সম্মানী প্রদানের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করছে। নারীদের জন্য 'পিঙ্ক বাস সার্ভিস', বৈষম্যহীন কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' ইত্যাদি কর্মসূচি চালু হতে যাচ্ছে। এ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস, ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস, বাবা দিবস উপলক্ষ্যে নিবন্ধ ছাড়াও গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনি এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে ২০২৬ সালের জুন *সচিত্র বাংলাদেশ* সংখ্যা।

আশা করি, এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

নিবন্ধ/গ্রন্থ আলোচনা/স্বাস্থ্যকথা/স্মৃতিচারণ/ভ্রমণকাহিনি

ধর্মীয় আলোকে বৃক্ষরোপণ ৪
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

প্রাচীন বাংলাদেশের ভাস্কর্য ৮
মোহা. মোশাররফ হোসেন

পরিবেশ সচেনতা— বাঁচবে পৃথিবী, বাঁচবে মানবজাতি ১১
মুহা. শিপলু জামান

নজরুলের *শিউলিমালা* গল্পগ্রন্থ: প্রেম ও দ্রোহের মিশ্রণ ১৫
ড. আশরাফ পিন্টু

পাবলিক সার্ভিস দিবস: উন্নয়ন ও জনসেবার সেতুবন্ধ ১৮
প্রফেসর ড. সবুজ শামীম আহসান

বৃক্ষরোপণেই টেকসই বাংলাদেশের নতুন দিগন্ত ২১
মিজানুর রহমান মিথুন

বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ২৩
মো. মামুন অর রশিদ

আমাদের পরিযায়ী পাখি ২৬
আশিকুর রহমান সমী

হাম: সচেতনতা, প্রতিরোধ ও আমাদের করণীয় ২৯
ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস ৩১
তন্বী তাবাসসুম

তামাক ও নিকোটিন আসক্তি থেকে সুরক্ষা ৩৪
সৈয়দা অনন্যা রহমান

‘ফুলকবি’ সুফিয়া কামাল ৩৭
ইমরুল ইউসুফ

ফসল কাটার গান ৪১
কাজী আলিম-উজ-জামান

শীর্ষ শিষ্য: লালন দুহিতা দেবোরা কিউকারম্যান ৪৩
মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান

বাবার জন্যে একগুচ্ছ কথামালা ৪৭
মিয়াজান কবীর

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান ৪৯
ডা. প্রিয়াংকা বিশ্বাস

নরকের সিঁড়ি থেকে স্বর্গের সিঁড়ি ৫১
মো. বেলায়েত হোসেন

শিশুশ্রম নিরসনে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা ৫৪
শারমিন ইসলাম

গল্প

দূরের আকাশ ৫৬
আশরাফ উদ্‌দীন আহ্‌মদ

সমাপতনের নির্মম সৌন্দর্য ৬২
অদ্বৈত মারুত

কবিতা

৬০-৬১
বদরুল হক, মো. আনাস রহমান, জহিরুল হক বিদ্যুৎ
এ কে এম মোস্তফা, সাঈদ বারী, ফরিদ সাইদ, বিভাস গুহ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য অভিনেতা আতাউর রহমান ৬৪

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৩ই জুন ২০২৬ কক্সবাজারের চকোরিয়ায় মালুমঘাট সংরক্ষিত বনে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে দেশব্যাপী 'পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি'র উদ্বোধন করেন— পিআইডি

ধর্মীয় আলোকে বৃক্ষরোপণ

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমাদের বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবহাওয়ার বেশ পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। পৃথিবীজুড়ে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই প্রকৃতির বৈরী আচরণের বড়ো শিকার হচ্ছে মানবজাতি; এর প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। উন্নত বিশ্বে উন্নয়নের মহাযজ্ঞে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অনবরত কার্বন নিঃসরণ বাড়ছে। এ কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতাও বাড়ছে সমান হারে। পাশাপাশি বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ায় ক্রমশ মেরু অঞ্চলের বরফ গলে বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। এতে জলবায়ুর ওপরও ফেলছে বিরূপ প্রভাব। জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির অন্যতম প্রধান শিকারে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বজ্রপাত, ভূমিকম্প, বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়) একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য প্রধানত পরিবেশ দূষণকেই দায়ী করেছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ।

পরিবেশ দূষণ হলো মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের উপাদানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। বিভিন্ন কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ হলো– জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন, বনজ সম্পদের ধ্বংস, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ যত্রতত্র নিঃসরণ, সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, যানবাহন ও কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার, যুদ্ধবিগ্রহ, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা, গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। সাধারণত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমভাবে পরিবেশ দূষিত হতে পারে। প্রাকৃতিক দূষণের মধ্যে রয়েছে সিসা, পারদ, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন (সিএফসি) প্রভৃতি। আর কৃত্রিম দূষণকারী উপাদানের মধ্যে রয়েছে কীটনাশক, ডিটারজেন্ট ইত্যাদি।

বায়ু প্রকৃতির এক অফুরন্ত নিয়ামক। এ বায়ু ছাড়া শুধু মানুষই নয়, বরং সমস্ত জীবের এক মুহূর্ত বাঁচা অসম্ভব। কিন্তু তারপরেও এ বায়ুই আজ নানাভাবে দূষিত হয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এক বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন জ্বালানি; যেমন– তেল, গ্যাস, কয়লা, কাঠ, লতাপাতা পুড়ে প্রতিনিয়তই বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়াও ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, জীবাশ্ম জ্বালানি, রাসায়নিক পদার্থের পোড়া ধোঁয়া বায়ুকে প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এতে করে অসময়ে বর্ষণ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অকাল বন্যার মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি করছে।

ধোঁয়া, ধূলিকণা ও নানাবিধ দূষণের কারণে মানুষের মাথা ধরা, শ্বাসকষ্ট, স্ট্রোক, হাঁপানি, চর্ম রোগ, যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যানসার ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও পৃথিবীর এই অনাকাঙ্ক্ষিত উষ্ণায়ন তথা দূষণের কারণে ওজোন স্তর ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, যার ফলে এই ভূ-ভাগে বিনা বাধায় সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি চলে আসার দ্বারপ্রান্তে, যা এই পৃথিবী নামক গ্রহবাসীর জন্য রীতিমতো অশনিসংকেত।

বায়ু দূষণের মূলে রয়েছে কলকারখানা, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ির জ্বালানি পুড়ে বিষাক্ত ধোঁয়া, ঘরবাড়ি ও ব্যাবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উত্তাপ সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি এবং নানান আবর্জনা। বিভিন্ন অক্সাইড বাতাসের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে তৈরি করে সালফার এবং নাইট্রোজেনের অম্ল। এই অম্ল পরে নিচে নেমে এসে পানি ও মাটির সঙ্গে মিশে যায়; এরই নাম এসিড বৃষ্টি। বায়ু দূষণের বিপর্যয় সম্পর্কে পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ আশঙ্কা করেছেন, বায়ুতে যদি কার্বন ডাই-অক্সাইড ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর তার ফলে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের গড় তাপমাত্রা যদি ২০ সে. বৃদ্ধি পায় তাহলে উত্তর সাগরের বরফ গলে সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। এই পরিবেশ দূষণকারী কয়লার ধোঁয়া ও ধুলোবালি যদি প্রাণদায়ী সূর্যালোককে পৃথিবীতে পৌঁছাতে বাধা দেয় তবে তার ফল হবে আরও ভয়াবহ।

পরিবেশ রক্ষার জন্যে যে-কোনো দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৬% বনভূমি। সুতরাং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্যে আমাদেরকে এ মুহূর্তে দেশের মোট আয়তনের ৩০% জায়গা বনায়নের আওতায় আনা অতীব প্রয়োজন।

বৃক্ষ আমাদের পরম বন্ধু। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রেই বৃক্ষের উপযোগিতা অপরিসীম। উপরন্তু তার সৌন্দর্যে হৃদয় আপ্লুত হয়, মনে প্রফুল্লতা আনে, ফলমূলসহ বৃক্ষের অন্যান্য উপাদান জীবের বেঁচে থাকার অন্যতম পাথেয়। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে সবুজ-শ্যামল পৃথিবীর অস্তিত্ব আজ প্রায় বিপন্ন। বিষাক্ত গ্যাসের কবলে পৃথিবীর বাতাস হয়ে উঠেছে ভারী এবং প্রাণীর জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। ঠিক এমনই সময় বিজ্ঞানীগণ এ সুন্দর ভুবনকে সুরক্ষার জন্য, প্রাণিজগতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একটিমাত্র পথ আবিষ্কার করলেন, আর তা হলো 'বৃক্ষরোপণ'।

গাছপালা খাদ্য তৈরির সময় সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন ত্যাগ করে। সমগ্র মানবকুল বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। উদ্ভিদ যদি সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ত্যাগ না করত তবে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যেত এবং প্রাণিকুল ধ্বংসের মুখে পতিত হতো। সুতরাং প্রাণীর স্বাভাবিক শ্বাসকার্যে সহায়তা করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। যে এলাকায় গাছ থাকে না, সে এলাকা রুক্ষ মরুভূমিতে পরিণত হয়। জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব রক্ষায় গাছের ভূমিকা অতুলনীয়। প্রায় সব গাছেই রয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার উপাদান। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তাল জাতীয় গাছের (খেজুর, সুপারি, নারিকেল, পাম) রয়েছে অপরিসীম সক্ষমতা। এসব গাছের পাতা বাতাসের গতিবেগ কমিয়ে দেয়। খুব উঁচু হয় বলে বজ্রপাত প্রতিহত করে। এছাড়া তাল জাতীয় গাছ সব ধরনের মাটিতে জন্মায়। কোনো পরিচর্যা ছাড়াই এসব গাছ নিজস্ব শক্তিতে সোজা ও উপরের দিকে লম্বা হয়ে ওঠে। রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ তেমন চোখে পড়ে না এবং এ জাতীয় গাছের তলায় অন্য ফসলও আবাদ করা যায়।

সর্বশেষ গত ২০১৭ সালের মে মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বজ্রপাতকেও বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বজ্রপাতে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি হলেও আগে সরকারি নথিতে বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করা হয়নি। অথচ বিশ্বে বজ্রপাতে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয় বাংলাদেশে।

সারা পৃথিবীতে যত মানুষ বজ্রপাতে মারা যায়, তার এক-চতুর্থাংশ মারা যায় এ দেশে।

এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিক যদি এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, বিশেষ করে তাল জাতীয় গাছ বেশি পরিমাণে রোপণ করে তাহলে বজ্রপাতসহ প্রাকৃতিক এসব দুর্যোগ থেকে বহুলাংশে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পৃথিবীজুড়ে প্রচলিত প্রায় সকল ধর্মেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিশেষ তাগিদ প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ হিসেবে ফলদ-বনজ ও সবুজ-শ্যামল বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেছেন। বনভূমির মাধ্যমে পৃথিবীকে সুশোভিত ও অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। গাছপালার মাধ্যমে ভূমণ্ডল ও পরিবেশ-প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণের শিক্ষা দিয়েছেন। একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি ও তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে নয়নাভিরাম সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্গত করেছি। আর আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টিবর্ষণ করি এবং এর দ্বারা উদ্যান ও পরিপক্ব শস্যরাজি উদ্গত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয়।' (*সুরা কাহফ*: ৭-৯)

বৃক্ষরাজি যে কত বড়ো নিয়ামত, পবিত্র *কোরানের* একাধিক আয়াতের মাধ্যমে তা প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– 'তারা কি লক্ষ করে না, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, যা থেকে তাদের গবাদি পশু এবং তারা নিজেরা আহার গ্রহণ করে।' (*সুরা সাজদা*: ২৭)

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের কথা বলেছেন। বিনা প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন বা বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত ছিঁড়তে মহানবি (সা.) নিষেধ করেছেন। তিনি যুদ্ধকালীন অবস্থায় বৃক্ষ কর্তন ও ফসল বিনষ্ট থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। একজন সাহাবি একটি গাছের পাতা ছিঁড়লে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'গাছের প্রত্যেকটি পাতা সর্বদা আল্লাহর গুণকীর্তন করে থাকে; কাজেই অপ্রয়োজনে পাতা ছিঁড়বে না'। গাছপালা বায়ু দূষণ রোধ করে। বায়ু থেকে দূষিত গ্যাস শোষণ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য বায়ু এক অপরিহার্য উপাদান। আর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর একান্ত প্রয়োজন। বায়ু যাতে দূষিত না হয় সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অনুরূপভাবে আমাদের সামাজিক পরিবেশের সব কিছুকে সংরক্ষণ করাও আমাদের সকলের দায়িত্ব। সেগুলোর অপব্যবহার ও নষ্ট করা খুবই অন্যায় কাজ।

গাছ লাগানোকে *হাদিস শরিফে* উত্তম ইবাদত বলা হয়েছে। ইসলামি পরিভাষায় যাকে সদকায়ে জারিয়া বলা হয়েছে। হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'কোনো মুসলমান যদি একটি বীজ বপণ করে অথবা একটি গাছের চারা রোপণ করে এবং পরবর্তীতে ঐ গাছটিতে ফলফলাদি জন্মালে তা যদি কোনো মানুষ, পাখি অথবা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে'। (*সহিহ্ বুখারি*: ২৩২০)

এ হাদিসটি আরও স্পষ্ট করে অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ করে তা ফলদার হওয়া পর্যন্ত তার পরিচর্যা ও সংরক্ষণে ধৈর্য ধারণ করে, তার প্রতিটি ফল নষ্ট হলেও তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে সদকার সওয়াব দান করবেন।' (*মুসনাদে আহমাদ*: ১৬৭০২)

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোনো বৃক্ষ রোপণ করে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে ওই বৃক্ষের ফলের সমপরিমাণ প্রতিদান দান করবেন।' (*মুসনাদে আহমাদ*: ২৩৫৬৭)

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করতে নির্দেশ দিয়ে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে কিয়ামত এসে গেছে, তখন হাতে যদি একটি গাছের চারা থাকে, যা রোপণ করা যায়, তবে সেই চারাটি রোপণ করবে।' (*সহিহ্ বুখারি, আদাবুল মুফরাদ*: ৪৭৯, *মুসনাদে আহমাদ*)

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ গাছ। এই সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের। অকারণে গাছ কাটা এবং শস্য নষ্ট করা গুরুতর অন্যায়। জরুরি পরিস্থিতি তথা যুদ্ধের সময়ও নবি করিম (সা.) গাছ কাটতে নিষেধ করছেন। সাহাবি হজরত ইবনে সাঈদ (রা.) বর্ণনায় রাসুল (সা.) বলেছেন, 'মদিনার প্রতিটি প্রান্তে সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে গাছপালা মুণ্ডানো এবং কাটা না হয়, তবে যেগুলো উট খেয়ে ফেলে সেগুলো ব্যতীত' (*সুনানে আবু দাউদ*)। অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে– 'যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে গাছ কাটবে (যে গাছ মানুষের উপকার করত), মহান আল্লাহ তার মাথা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন।' (*বায়হাকি*)

হিন্দু ধর্মে বৃক্ষরোপণ কেবল পরিবেশগত দায়িত্ব নয়, বরং একটি অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্যময় কাজ, যা ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গীয় ফল প্রদান করে। শাস্ত্রমতে, একটি বৃক্ষরোপণ করা ১০টি পুত্রসন্তান লালনপালনের সমান পুণ্য অর্জনের সমতুল্য। বৃক্ষকে দেবতাতুল্য মনে করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে, এগুলো ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ।

হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী বৃক্ষ হলো পবিত্র আত্মার আধার, যা পৃথিবী ও মানবজাতির সমৃদ্ধি করে। *পুরাণ* অনুযায়ী, অশ্বত্থ, নিম, আমলকী, বট বা আম গাছ লাগালে অশেষ পুণ্য লাভ হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, বৃক্ষরোপণকারী কখনও নরক দর্শন করেন না এবং এটি পূর্বপুরুষদেরও তৃপ্তি দেয়। তাছাড়া এ ধর্মে গাছকে ঈশ্বরতুল্য মনে করা হয়। বট গাছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বাস, অশ্বত্থে শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ এবং তুলসীতে দেবী লক্ষ্মী অবস্থান করেন বলে বিশ্বাস করা হয়।

বৌদ্ধ ধর্মে বৃক্ষরোপণ এবং অরণ্য সংরক্ষণ অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ এবং মহাপরিনির্বাণ ও জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বৃক্ষের সঙ্গে জড়িত, যা এই ধর্মে প্রকৃতির গুরুত্বকে নির্দেশ করে। ধারণা করা হয়, বৃক্ষ রোপণকারী ব্যক্তি অশ্বত্থ, বট বা ফলদ গাছ লাগালে নরক দর্শন করেন না এবং দীর্ঘায়ু লাভ করেন।

গাছকে দীর্ঘায়ু ও সহানুভূতির প্রতীক মনে করা হয়। বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাভের স্থানটি ছিল বোধিবৃক্ষ (অশ্বত্থ গাছ) এর নিচে। এছাড়া, বৌদ্ধধর্মে ১০৮ সংখ্যাটিকে পবিত্র মনে করা হয়, তাই অনেক সময় ১০৮টি বৃক্ষ রোপণ করার রীতিও রয়েছে। তাছাড়া বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অরণ্য নিধন রোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অরণ্যকে পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়, যা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল বাণী হলো 'জীবে প্রেম'। বৃক্ষরোপণ শুধু মানুষের উপকার করে না, বরং পশুপাখি ও প্রকৃতির সমস্ত জীবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। বৌদ্ধ ধর্মে বৃক্ষকে প্রকৃতির আশীর্বাদ মনে করা হয়, যা মানুষকে ছায়া ও খাদ্য প্রদান করে।

খ্রিষ্ট ধর্মে বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একে ঈশ্বরের সৃষ্টিজগৎ (Creation) রক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে প্রকৃতি হলো ঈশ্বরের উপহার এবং মানুষ হলো এই সৃষ্টির রক্ষক, ভোক্তা নয়।

বাইবেলের আদিপুস্তক (*Genesis*) অনুযায়ী, ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবী ও প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। গাছপালা রোপণ ও পরিবেশ রক্ষা করা হলো সেই পবিত্র দায়িত্বের (Stewardship) একটি অংশ।

খ্রিষ্টীয় মতবাদ অনুযায়ী, বৃক্ষ বায়ু ও জল পরিশোধনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখে। সুস্থ পরিবেশ মানুষের শরীর ও আত্মার জন্য কল্যাণকর। গাছপালা কেবল মানুষের আহার বা ছায়া দেয় না, বরং বন্যপ্রাণী ও পাখিদের আবাসস্থল।

ইহুদি ধর্মে বৃক্ষরোপণ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, পবিত্র এবং সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। এটি কেবল পরিবেশগত কারণে নয় বরং ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহুদি বিশ্বাস মতে, মানুষ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির রক্ষক। 'টিক্কুন ওলাম' (Tikkun Olam) বা 'বিশ্ব নিরাময়' ধারণার অংশ হিসেবে পরিবেশ রক্ষা ও বৃক্ষরোপণকে দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইহুদি ধর্মে গাছকে উৎসর্গ করে একটি বিশেষ নববর্ষ পালিত হয়, যা তু বি'শেভাত (Tu BiShvat) বা 'গাছের নতুন বছর' নামে পরিচিত উৎসব, যা শীতকালে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে বৃক্ষরোপণ করা এবং গাছের প্রশংসা করা একটি প্রধান ঐতিহ্য, যা প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

পবিত্র *বাইবেলে* গাছকে মানুষের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। *হিব্রু বাইবেল (তোরাহ)* অনুসারে, ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টির সময় অন্য যে-কোনো জীবের আগে গাছপালা সৃষ্টি করেছিলেন। তাই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অংশীদার হয়। এছাড়াও ইহুদি ধর্মে বৃক্ষরোপণ হলো সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা, ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্বশীলতা এবং তাদের নিজস্ব ভূমি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে থাকার একটি পবিত্র উপায়। ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থ *তালমুদ (Talmud)*-এ একটি প্রবাদ আছে, 'তোমার পূর্বপুরুষরা যেমন তোমার জন্য গাছ লাগিয়েছিলেন, তেমনি তোমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তোমারও গাছ লাগানো উচিত।'

তাই পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তথা এই সুন্দর পৃথিবীকে সকল প্রাণীর জন্য নিরাপদ রাখতে বৃক্ষরোপণ অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে সকল নাগরিক যার যার অবস্থানে থেকে বৃক্ষরোপণে সচেষ্ট হলে এ ধরার সকল প্রান্তে শান্তির সুবাতাস বইবে– এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ, dr.alim1978@gmail.com

প্রাচীন বাংলাদেশের ভাস্কর্য

মোহা. মোশাররফ হোসেন

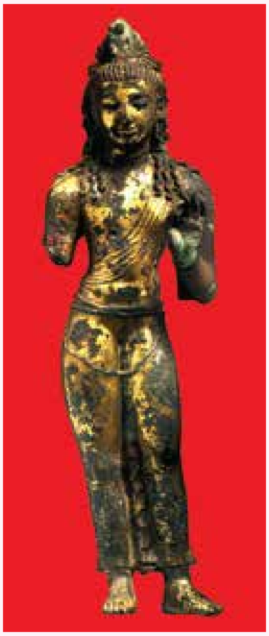

এ যাবৎ আবিষ্কৃত ভাস্কর্যের সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে বিপুল হলেও সবই ধর্মীয়। সেগুলোর তুলনায় নান্দনিকতার তাগিদে গড়া ভাস্কর্যের সংখ্যা নেহাত অপ্রতুল। প্রাপ্তিস্থলগুলো ছড়িয়ে আছে হয় কোনো বিজন প্রান্তে নতুবা লোকালয়ের ধারে-কাছে। এক্ষেত্রে কৌতূহল উদ্দীপক আরও একটি বিষয় হলো সেগুলোর একটি বড়ো অংশ উদ্ধার করা হয়েছে পুকুর থেকে একত্রে একাধিক সংখ্যায়। দ্বিতীয় বিপুল অংশটির নিদর্শনগুলো বিক্ষিপ্তভাবে নদীর তলদেশ, জমির পিঠ, গাছের নিচে কিংবা কাণ্ডে প্রোথিত ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত অবস্থা থেকে জাদুঘর কিংবা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংগৃহীত অথবা চোরাকারবারিদের কবল থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্ধারকৃত। একেবারে সীমিত সংখ্যক এসেছে বিভিন্ন প্রত্নস্থলে সমাপিত পুরাবিদ্যাগত উৎখননের মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে গবেষকগণের প্রধান অবলম্বন দাঁড়ায় পুরাবিদ্যাগত কার্যক্রম কিংবা জাদুঘরের রেজিস্টার পর্যালোচনা করা। তবে আলোচনাধীন নিবন্ধটির কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার তাগিদে কেবল কয়টি দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শন উপস্থাপন করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তিস্থল

গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যে বগুড়ার পুণ্ড্রনগর/মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি-কোটবাড়ি-শালমানপুর, নওগাঁয়ের পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও জগদ্দল মহাবিহার, দিনাজপুরের সীতাকোট বিহার, রাজশাহীর বিহরাইল, ঢাকার সাভারের হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদ পুরাটিবিসহ রাজাসন প্রভৃতি বহুল আলোচিত। আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলোর বিষয়বস্তু হলো হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের দেবদেবী এবং লোকজ ধর্মীয় পরিমণ্ডলের যক্ষ-যক্ষিণী। সেগুলোর বাইরে বগুড়ার স্কন্ধ ধাপে পাওয়া লালচে বেলেপাথরে ছেঁটেগড়া মাঝারি পরিমাপের একটি কার্তিক/স্কন্ধ, বাসুবিহারে পাওয়া সাদামাটা পাথরে ছেঁটেগড়া একটি বুদ্ধ, বলাই ধাপে পাওয়া ধাতুতে ঢেলেগড়া মঞ্জুশ্রী ও মহাস্থানগড়ে পাওয়া পোড়ামাটিতে গড়া একটি সূর্যের, সময়পর্ব খ্রিষ্টীয় ছয়-সাত শতাব্দ ধরে নেওয়া হয়েছে। ময়নামতি-কোটবাড়ি-শালমানপুরে পাওয়া নিদর্শনগুলোর বেশির ভাগই বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবী। তবে এগুলোর মধ্যে দুটি ধাতব মূর্তি ও একটি চুন-বালিতে গড়া তথাগত একদিকে যেমন আকারে যথেষ্ট বড়ো তেমনি শৈলী বিবেচনায় অদ্বিতীয়। সময়পর্ব ধরা হয়েছে খ্রিষ্টীয় আট-দশ শতাব্দ। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও জগদ্দল মহাবিহারের নিদর্শনগুলোর প্রসঙ্গেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। তবে এ প্রত্নস্থলটির একটি ধাতব নিদর্শন জৈন ধর্মের শলকপুরুষ ও একটি পাথরে ছেঁটেগড়া নিদর্শন ধর্মবিবর্জিত amorous couple/মধুক্ষণ দম্পতি গণ্য করা হয়েছে। এছাড়া জৈন ধর্মীয় মাত্র চারটি তীর্থঙ্কর পাওয়া গেছে রাজশাহী ও দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রান্তে। দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার সীতাকোট বিহার, ঢাকার সাভার উপজেলা শহর সংলগ্ন হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবি, ময়নামতি-কোটবাড়ি-শালমানপুর ও বগুড়ার মহাস্থানগড়ের পশ্চিম দিকের দুটি পুরাঢিবিতে আবিষ্কৃত হয়েছে ছোটো পরিমাপের যথেষ্ট সংখ্যক ধাতব বোধিসত্ত ও প্রজ্ঞা। কাঠে ছেঁটেগড়া নিদর্শন পাওয়া গেছে কেবল কুমিল্লা অঞ্চলে। সেগুলোর সময়পর্ব মোটামুটি খ্রিষ্টীয় এগারো-বারো শতাব্দে ন্যস্ত করা যায়। সর্বোপরি, এ সময়পর্বটিতে কালোপাথরে ছেঁটেগড়া প্রচুর সংখ্যক মাঝারি পরিমাপের মূর্তি পাওয়া গেছে মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, এ যাবৎ মুন্সিগঞ্জে একটিও জৈন ধর্মীয় নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অন্যান্য প্রাপ্তিস্থলগুলো চিহ্নিত হয়েছে রাজশাহীর গোদাগাড়ির পদুমশহর, জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল-পাঁচবিবি, বগুড়ার কালাই, চাপাইনবাবগঞ্জের রোহনপুর, দিনাজপুরের চিরিরবন্দর ও পার্বতীপুর, নওগাঁয়ের ধামুরহাট-নিয়ামতপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল, কুমিল্লার দেউলবাড়ি-গুনাইঘর, চট্টগ্রামের ঝিউড়ি, সিলেটের বন্দরবাজার, গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি ও ঢাকার তেজগাঁও এলাকায়।

উপকরণের নমুনা

ভাস্কর্য গড়ার উপকরণাদির সুলভ্যতা বিচারে যদিও বাংলাদেশে ভাস্কর্য গড়ার ক্ষেত্রে মাটি ও কাঠ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কথা তথাপি এ যাবৎ সন্ধানলব্ধ সিংহভাগ নিদর্শনই হলো পাথর ও মিশ্র ধাতুতে

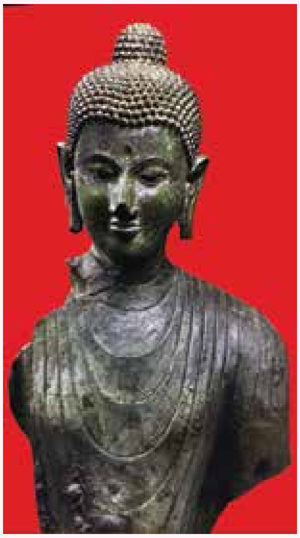

গড়া। পাশাপাশি চুন-বালির মিশেলজাত অথবা ছিটে-ফোঁটা নিদর্শন পাওয়া গেছে। সম্ভবত মাটি ও কাঠের ভঙ্গুর ও পচনশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দরুন এ দুটি উপকরণে গড়া নিদর্শনগুলোর মূল অংশটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তা যা-ই হোক, পাথর ও ধাতু বর্তমানের মতো অতীতেও আশপাশের দেশগুলো থেকে আমদানি করতে হতো। বিশেষ করে পাথরের জন্য নির্ভর করতে হতো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, পাললিক শিলা গোত্রের বেলেপাথর (sandstone) ছাড়াও আগ্নেয়শিলাজাত গ্রানাইট আসত বিহার রাজ্যের চুনার (হলুদ আভাযুক্ত বেলেপাথর), গয়া, উড়িষ্যা ও আগ্রা (লালচে আভার বেলেপাথর), রাজস্থান থেকে চুনাপাথর, দক্ষিণ ভারত থেকে ট্রাপ, গুজরাট থেকে সিস্ট এবং রাজমহলসহ সংলগ্ন কিছু এলাকা থেকে কষ্টিপাথর (গড়পড়তা কালোপাথর এবং এর মধ্যে মূলত ব্ল্যাকক্লোরাইট, নীল আভাযুক্ত সিস্ট ও carbonijerous shale অন্তর্ভুক্ত থাকে)। এর মধ্যে প্রথম দুটির ব্যবহার পাল শাসনামল পূর্ব (আদি থেকে খ্রি. সাত-আট শতাব্দ) অবধি এবং অতঃপর একচেটিয়াভাবে কষ্টিপাথর ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, হয় সেসবের প্রাপ্তিস্থলের নিকটবর্তী কর্মশালাগুলো থেকে মূর্তি-ভাস্কর্য গড়িয়ে আনা হতো কিংবা উপকরণ সংগ্রহ করে এ দেশের কর্মশালায় (অস্তিত্বের বিষয়টি এ যাবৎ প্রমাণের অপেক্ষাধীন?) ছেঁটেগড়া হতো। এক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, উল্লিখিত উপকরণগুলো দিয়ে গড়া নিদর্শনগুলোর পাশাপাশি সামান্য পরিমাণে হলেও স্থানীয়ভাবে লভ্য রূপান্তরিত শিলা গোত্রের সেল শ্রেণিভুক্ত মেটেপাথর/বালিপাথর (soft clay stone) ব্যবহারের নজির পাওয়া যায়। এটির প্রাপ্তিস্থল ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম। তবে শেষের এ পাথরটি অনেক ক্ষেত্রেই বেলেপাথর ঠাঁওরে নেওয়ার মতো ভুল হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় এটাও ধরে নেওয়া যায় যে, দেশে লভ্য মেটেপাথর/বালিপাথর) ওপর নির্ভর করে দেশের ভেতরেও একাধিক কর্মশালা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নিদর্শনগুলোর শৈলীগত বিন্যাসে বিদ্যমান থাকা গড়পড়তা কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে এমন ধারণা পোষিত হতে পারে যে, দেশজ কর্মশালাগুলোতে শ্রমদাতা ভূমিজ ভাস্করগণ হয়ত-বা বৈদেশিক কর্মশালাগুলোতে (বিশেষ করে মগধ/দক্ষিণ বিহার) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে আরও একটি তথ্য সংযোজিত হব।

সময়পর্ব নির্ধারণ

নেহাত কিছু নিদর্শনে লিপিভাষ্য উৎকীর্ণ থাকার সূত্র ধরে এবং উৎখননে পাওয়া নিদর্শনগুলো মাটির কোন পরতে পাওয়া গেল সেটির ওপর নির্ভর করে একটি নিদর্শনের সুনির্ধারিত সময়পর্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হলেও অবশিষ্ট সিংহভাগ নিদর্শনের ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন হলো কারিগরি ঘরানার তল্লাশি।

কারিগরি ঘরানা

এক্ষেত্রে প্রথমেই যা পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয় সেটি হলো নিদর্শনটি কোন ধরনের উপকরণ থেকে গড়া। মাটি বা কাঠ যদি উপকরণ হয় তবে ঝামেলা তেমন একটা হয় না। কারণ, এ দুটি উপকরণই আমাদের দেশে সহজলভ্য। কিন্তু উপকরণটি যদি ধাতু কিংবা পাথর হয় তবে সেগুলোর উৎসস্থান কোথায় সেটি তলিয়ে দেখার প্রয়োজন হয় এ কারণে যে, এ দুটি উপকরণ আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। এগুলোর উৎসস্থল আমাদের পড়শি দেশ ভারত ও মিয়ানমার। ভারতের মথুরা মূর্তি-ভাস্কর্য ঘরানায় হলুদ আভাযুক্ত বেলেপাথর, বোধগয়ার কর্মশালাগুলোতে ধূসর আভা বিশিষ্ট কষ্টিপাথর, পাটনার নিকটবর্তী কানহর ও নওদা কর্মশালায় হালকা ধূসর কষ্টিপাথর, নালন্দা ঘরানাসহ কুরকিহার ও বিহার রাজ্যের অন্যান্য ঘরানায় ব্ল্যাকক্লোরাইট এবং দক্ষিণ ভারতের পরবর্তী চালুক্য শাসনামলে (খ্রি. বারো-তেরো শতাব্দ) মিহি দানাদার উৎকৃষ্টমানের ব্ল্যাকক্লোরাইট ব্যবহৃত হতো। হাল আমলে আরও দেখা গেছে যে, সাঁওতাল পরগনার বাকুটিসহ সুখিয়া পাহাড় লাল রঙের বেলেপাথরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ধাতব উপকরণের মধ্যে মিশেলধাতুর (প্রচলিত অর্থে ব্রোঞ্জ) প্রাধান্য বহাল ছিল। এটির জন্য প্রধানত প্রয়োজন হতো ১% টিন ও ৯% তামা। টিনের প্রধান নিকটতম উৎস ছিল মিয়ানমার এবং তামার নিকটতম উৎস ছিল বীরভূম। তবে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে, প্রায় সারা ভারতেই তামা পাওয়া যেত। অন্যান্য আনুষঙ্গিক পর্যায়ের মৌলিক ধাতুগুলোর মধ্যে সোনা (নিকটতম উৎস: দাক্ষিণাত্যের কোলান এলাকার নিকটবর্তী হাতি খনি), রুপা (নিকটতম উৎস: বিহারের সাঁওতাল পরগনার দেওগড় ও পশ্চিমবঙ্গের মানভূম) প্রভৃতির নাম করা যায়।

সুতরাং পাথর ও ধাতব নিদর্শনগুলোর সময়পর্ব অনুসন্ধানে কর্মশালার অনুসন্ধান করতে হয়।

কর্মশালার অনুসন্ধান

খ্রি. ১৮৯১ সনে দাক্ষিণাত্যের কানহেরী গুহায় কাঠে ছেঁটেগড়া এমন একটি তারা মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল যেটির প্রাপ্তিস্থলে পাওয়া অন্যান্য লিপিবিদ্যাগত সূত্রের ওপর নির্ভর করে জ্যেষ্ঠ গবেষকগণের ধারণা এই যে, উক্ত নিদর্শনটি খ্রি. ৮৬৭ সনে বাংলাদেশের কোনো তীর্থ ভ্রমণকারী উৎসর্গ করেছিলেন। দুই. গোবিন্দ কেশবসেনের ভাটেরা তামার লিপিফলক ও সেন আমলের ইদিলপুর তামার লিপিফলক থেকে জানা যায় যে, সেগুলোর সমকালে 'দণ্ডকার' পদবিধারী কারিগরি সম্প্রদায় হাতির দাঁত খোদাই করে শিল্পকর্ম গড়ত। তিন. খ্রি. ষোলো শতাব্দের তিব্বতি কালচক্রযানী লামা তারনাথ তাঁর বিবরণীতে ধীমান ও বীতপাল নামে পাল সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপালের সমকালিক দুজন বিখ্যাত ভাস্করের উল্লেখ করেছেন। পিতা ধীমান বাস করতেন বরেন্দ্রে আর আত্মজ বীতপাল বঙ্গে। তারা নাগ বংশীয় শিল্পীদের ধারাবাহিকতায় তাদের শৈলী অব্যাহত রেখেছিল। একই সূত্র থেকে জয়া, পরাজয়া ও বিজয়া নামের আরও তিনজন শিল্পীর নাম জানা যায়। চার. বিজয়সেনের দেওপাড়া (গোদাবাড়ি) পাথর লিপিভাষ্যে আরও পাওয়া যায় বারেন্দ্রিক শিল্পগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপানি ভাষ্য। পাঁচ. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টিঘর কাঠের মূর্তির সন্ধান লাভ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে অঞ্চলে আরও প্রাচীন আমল থেকে তক্ষণ শিল্প অব্যাহত ছিল। ছয়. সেটির সংলগ্ন কুমিল্লা এবং এপার মেঘনার মুন্সিগঞ্জে প্রাচীন সমতট-হরিকেল ভূভাগে সহজলভ্য বেলেপাথরে ছাঁটগড়া বেশ কটি মূর্তি-ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। সাত. সম্প্রতি চাপাইনবাবগঞ্জ জেলাসহ বগুড়ায় পাথরে ছেঁটেগড়া মূর্তি-ভাস্কর্য তৈরির উপযোগী কিছু পট্টঠেস (backrest/backslab) ও কিছু অসমাপ্ত শ্রেণির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং ধরে নিতে বাধা থাকে না যে, এ নিবন্ধের আলোচ্য সময়পর্বের বাংলাদেশে অন্তত তিনটি মূর্তি-ভাস্কর্য কর্মশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেগুলো হলো বরেন্দ্র (বর্তমান রাজশাহী বিভাগের লালরঙা মাটির নাতিউত্তল অঞ্চল), বঙ্গ (বিক্রমপুর/মুন্সিগঞ্জের কোনো-এক প্রান্তর) এবং সমতট-হরিকেল (চট্টগ্রাম-সিলেট অঞ্চল)।

সমীক্ষা

এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীন মূর্তি-ভাস্কর্য নিদর্শনাদি প্রাপ্তির প্রেক্ষাপটসহ উপকরণ সুলভ্যতার বিষয় দুটির সমন্বয় করলে এটা অস্বীকার করার উপায় থাকে না যে, কম করে হলেও খ্রি. পূ. তিন শতাব্দের দিকে পোড়ামাটি কৌশলের ওপর ভিত্তি করে পুণ্ড্রনগর/মহাস্থানগড় কিংবা সেটির উপশহরকে কেন্দ্র করে এবং সেটির অনুবৃত্তিক্রমে কয়েক শতাব্দ পরে সমতট রাজনৈতিক অঞ্চলে কাঠনির্ভর মূর্তি-ভাস্কর্য গড়ার সূত্র ধরে গোটা বাংলাদেশে পাথরনির্ভর মূর্তি-ভাস্কর্যিক চর্চা বিকশিত হয়েছিল। পাশাপাশি তীর্থ-পর্যটনকারীদের মাধ্যমেও বিপুল সংখ্যক নিদর্শন এ দেশে বাহিত হয়ে এসেছিল।

পাল শাসনামলের গোড়ার দিকে (খ্রি. আট-দশ শতাব্দ) ধীমান ও বীটপালের প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্র ও বঙ্গের কর্মশালায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভাস্করগণ সমতটে ছড়িয়ে পড়ে সে অঞ্চলের চন্দ্র, পরবর্তী দেব ও অন্যান্য খুদে খুদে রাজবংশগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় হরিকেল (সিলেট-চট্টগ্রাম) এবং ত্রিপুরায় (বর্তমানে ভারতীয় রাজ্য) ছড়িয়ে পড়েছিল। সিলেটের কালাপুর, চট্টগ্রামের ঝিউড়ি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উনোকোটি, পিলাক, বক্তারপুর প্রভৃতি পুরাস্থলগুলো সে সাক্ষ্যই বহন করছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

- কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলার ভাস্কর্য*, কলকাতা, ১৯৮৬
- নারায়ণ স্যানাল, *হিন্দু ভাস্কর্যে মিথুন*, কলকাতা, ১৯৮০
- বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, *বৌদ্ধ দেবদেবী*, কলকাতা, ২০০৫
- শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পঞ্চোপসনা*, কলকাতা, ১৯৬০
- মোহা. মোশাররফ হোসেন, *হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণ*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ২০২৫
- শ্রীভাস্কর, *প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রকলা*, কলকাতা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ
- সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা*, কলকাতা, ১৯৭৮

মোহা. মোশাররফ হোসেন: লেখক, গবেষক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ

পরিবেশ সচেতনতা– বাঁচবে পৃথিবী, বাঁচবে মানবজাতি

মুহা. শিপলু জামান

বিশ্বে অন্যতম উন্নত রাষ্ট্র জাপানের টোকিওতে শৈশব কাটানো এক বাঙালি শিশুর গল্প (সত্য ঘটনা অবলম্বনে) দিয়ে শুরু করছি। মেয়েটির নাম মিজু (ছদ্মনাম), একটি জাপানি শব্দ যার অর্থ পানি। এ রকম নাম দেওয়ার কারণও আছে বৈকি; মেয়েটি ছিল অত্যধিক সহজ-সরল, বয়স ৫-৬ বছর, ছিপছিপে গড়ন কিন্তু মায়াবিনী, হাসি আর পাকামোতে সে অনন্য। তার সরলতার জন্যই সে মজার মজার কিছু কাজ করত। একদিন স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশে বাসার পাশে বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিল মিজু ও তার মা। জাপানের অন্যান্য সকল কিছুর মতোই বাসও সময় মেনে চলত। বাস তখনো এসে পৌঁছায়নি, মিজুর মা লক্ষ করল মেয়ে কাছে নেই একটু ভয় পেলেও সামলে নিলো, সে দেখতে পেল মেয়ে কাছেই একটি গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল নাচিয়ে একা একা কথা বলছে। ততক্ষণে বাস চলে এসেছে, মা মেয়েকে নিয়ে স্কুলে চলে গেল, পরের দিনও একই ঘটনা ঘটল। এবার মা মিজুকে জিজ্ঞেস করল তুমি কী করছিলে? মিজু স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মাথা আর হাত দিয়ে বুঝিয়ে বলতে লাগল, 'জানো আম্মু, গাছেরও জীবন আছে, ওরাও খায় এবং এজন্য বড়ো হয়। আমি প্রতিদিন ওই গাছের সাথে কথা বলি, কিন্তু কষ্ট লাগে ওরা কথা বলতে পারে না'। এটা বলতে বলতে সে কেঁদেই দিলো। মা তাকে আদর করে অভয় দিলো এবং গাছ নিয়ে অনেক গল্প করল। এরপর থেকে মিজু শুধু বাসস্টপ নয় যেখানেই বেড়াতে যেত সেখানেই গাছের সাথে কথা বলত, বিভিন্ন গাছের পরে থাকা পাতা কুড়িয়ে সংগ্রহ করত।

কিছুদিন পর একটা অসম্ভব ঘটনা ঘটল (জাপানে যা সচরাচর ঘটে না), রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য সেই গাছটি কাটা পরল, আর মিজুর সে কী কান্না। তাকে কোনোভাবেই থামানো সম্ভব হচ্ছিল না। পরে তাকে গাছের পরিবর্তে গাছ এনে দিতে হলো যদিও তা ছিল ইনডোর প্ল্যান্ট। মিজুর গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে, গাছের জীবন আছে, গাছকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে হবে, যত্ন নিতে হবে। যেহেতু গাছ জীবন্ত সেহেতু তাদের ক্ষতি করলে তারা কষ্ট পায় কিন্তু বলতে পারে না, তাদের কষ্টটা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আমাদের অনুধাবন করতে হবে। আসলে মানুষের অস্তিত্বের জন্যই গাছের এবং প্রকৃতির প্রতি আমাদের যত্নবান হতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা মাটি, বায়ু, পানি, শব্দ ইত্যাদির প্রতি আমাদের দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল ভূমিকা পালন করতে হবে এবং পরিবেশের প্রত্যেক উপাদানের দূষণ রোধ করতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ আজ ভয়াবহ হুমকি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ সমস্যা কেবল কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, সমাজ, অঞ্চল, দেশ বা জাতির নয়; বরং সমগ্র মানবজাতির। প্রাকৃতিক

ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশ আজ বিপন্ন। কিন্তু মানুষের বসবাস উপযোগী বিশ্ব গড়তে চাই দূষণমুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশ। তাই বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি সকল দেশের সকল সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য। প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে বিশ্বব্যাপী। সে প্রেক্ষাপটে ১৯৬৮ সালের ২০শে মে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের কাছে একটি চিঠি পাঠায় সুইডেন সরকার। সে বছরই জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি সাধারণ অধিবেশনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরের বছর জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সমাধানের উপায় খুঁজতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মতিতে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালের ৫ই জুন থেকে ১৬ই জুন জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি ইতিহাসের 'প্রথম পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন'-এর স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৩ সালে সম্মেলনের প্রথম দিন অর্থাৎ ৫ই জুনকে জাতিসংঘ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়। এরপর ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতিবছর দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে।

পরিবেশই প্রাণের ধারক, জীবনীশক্তির বাহক। সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার ওপরেই তার অস্তিত্ব নির্ভর করে আসছে। পরিবেশ প্রতিকূল হলে জীবের ধ্বংস ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পরিবেশের ওপর নির্ভর করে মানুষ, অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী-জীবনের বিকাশ। তাই পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় যোগসূত্র। কিন্তু নানা কারণে পরিবেশ দূষণ সমস্যা প্রকট হওয়ায় মানব সভ্যতা আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। এ থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে চলছে নানা ধরনের গবেষণা। পরিবেশ দূষণ রোধে শুধু দিবস পালন করলেই চলবে না পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু ভূমিকা রয়েছে। এটি একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা যা ব্যক্তি, সমাজ এবং সরকার সকলের অংশগ্রহণে সফল হতে পারে।

পরিবেশ সুরক্ষায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সচেতনতা। সচেতনতা প্রকৃতি ও পরিবেশকে সুন্দর রাখতে মানুষের বোধশক্তি জাগ্রত করতে পারে। এর ফলে বাঁচবে পৃথিবী, বাঁচবে মানবজাতি। এজন্য প্রয়োজন পরিবেশবান্ধব চিন্তা-চেতনা। পরিবেশ সংরক্ষণে আমরা কী কী করতে পারি এবং কী করা উচিত সেটা সংক্ষেপে বলা যাবে না, তবুও কিছু বিষয় তুলে ধরছি।

বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ: অধিক পরিমাণে গাছ লাগানো এবং বন উজাড় রোধ করা পরিবেশ রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। সভ্যতা ও উন্নয়নের প্রয়োজনে গাছ কাটতে হলে আগে একটির পরিবর্তে দুইটি গাছ লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ অপ্রতুল। অথচ দেশের সবচেয়ে বড়ো বন সুন্দরবন আমাদেরকে বিভিন্ন সময়ে সিডর বা আইলার মতো বড়ো বড়ো ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করেছে। তাই উপকূলীয় অঞ্চলসহ পুরো দেশে অধিকহারে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। এ কাজে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

গাছ প্রকৃতির অপূর্ব শোভা। গাছ মানুষসহ সব প্রাণীর বন্ধু। যে অঞ্চলে যত বেশি গাছপালা, সে অঞ্চল তত বেশি প্রাণবন্ত। গাছ অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি রোধ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার অন্যতম হাতিয়ার বনায়ন। পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি গাছ লাগানো একটি মহৎ কাজ; সে জন্যই রাসুল (সা.) বৃক্ষরোপণের জন্য সাহাবিদের উৎসাহিত করেছেন। তিনি বৃক্ষরোপণ ও ফসল বপনকে 'সদকায়ে জারিয়া' বলেছেন। রাসুল (সা.) বলেন, 'কোনো মুসলিম যদি বৃক্ষরোপণ করে বা খাদ্যশস্যের বীজ বপন করে, অতঃপর তা থেকে কোনো মানুষ, পাখি বা পশু কিছু খায়, তবে তার জন্য এ কাজ সদকা হিসেবে বিবেচিত হবে।' (*বুখারি* : ৫১৩)।

প্লাস্টিক বর্জন: একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (single-use plastic) ব্যবহার বন্ধ করা এবং পরিবেশবান্ধব পণ্যের ব্যবহার বাড়ানো পরিবেশ রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর ৮৭,০০০ টনেরও বেশি প্লাস্টিক বর্জ্য সামুদ্রিক পরিবেশে প্রবেশ করছে, যা আমাদের জন্য মারাত্মক পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এছাড়া ফসলের জমি এবং পয়ঃনিষ্কাশন লাইনে প্লাস্টিক পণ্য এবং পলিথিনের উপস্থিতি আমাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি করছে। এই পরিস্থিতিতে আধুনিক ও যুগোপযোগী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০৩০) বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ এ প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করতে হবে। এই কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য হলো ২০২৬ সালের মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য ৩০% হ্রাস, ৫০% পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং নির্দিষ্ট একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ৯০% বিলুপ্তি সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনে সকলকে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: যেখানে-সেখানে ময়লা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা এবং বর্জ্য রিসাইকেল (পুনর্ব্যবহার) করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাপানের মডেল অনুসরণ করা যায় যেখানে বর্জ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে নিষ্কাশন পুরো প্রক্রিয়া যথাযথ নিয়ম মেনে হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতের বর্জ্য যেমন পচনশীল, কাচ, টিন ইত্যাদি আলাদা আলাদা সংগ্রহ করা হয়। জাপানের মানুষজন সেই পদ্ধতি সুন্দরভাবে মেনে চলেন। এছাড়া রাস্তাঘাট, নিজস্ব বাড়িঘর, সীমানা এমনকি এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে জাপানিজদের নাগরিক দায়িত্ব পালন ও প্রচেষ্টা অনুসরণযোগ্য।

রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহার: অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার অভ্যাস পরিহার করা উচিত। ব্যবহৃত জিনিসপত্র কেনা এবং সেগুলো মেরামত করে ব্যবহার করলে পরিবেশের ওপর চাপ কমে। এছাড়াও, রিসাইকেল করা যায় এমন জিনিস পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। বর্তমান বিশ্বে প্লাস্টিক দ্রব্যের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশও রিসাইকেল করা হচ্ছে যা সম্পদের সুষ্ঠুব্যবহারের সাথে অপচয় রোধ করে। এছাড়া অপচয় করা আমাদের ধর্মের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই সকলকে রিসাইকেল পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

পানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়: পানির অপচয় রোধ করা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার না করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে পানি ও বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপলায়েন্সের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি সাশ্রয় করা সম্ভব। এছাড়া, পরিবেশবান্ধবের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সোলার পাওয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাসাবাড়ি ও অফিসে অপ্রয়োজনীয় ফ্যান, লাইট, এসি, ইলেকট্রিক হিটার, ওভেন ইত্যাদি ব্যবহারে দায়িত্বশীল হতে হবে। অফিস বা বাসা যাইই হোক, রুম থেকে বের হওয়ার সময় সকল ইলেকট্রিক যন্ত্র বন্ধ করতে হবে। ফলে বৈদ্যুতিক অপচয় রোধের পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করাও সম্ভব হবে।

সচেতনতা বৃদ্ধি: নিজে সচেতন হওয়া এবং পরিবার, সমাজ ও শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা পরিবেশ রক্ষার অন্যতম চাবিকাঠি। জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং মাটি, পানি ও বায়ু দূষণকারী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা, কম কার্বন নিঃসরণকারী যানবাহন ব্যবহার করা, ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে গণপরিবহণ, সাইকেল বা হেঁটে চলাফেরা করা, প্লাস্টিক ব্যবহার সীমিত করা, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া ইত্যাদি বিষয়ে সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে। আসলে সুন্দর পরিবেশ গড়তে নিজ বাড়ি থেকেই শুরু ও অভ্যাস করতে হবে।

পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও অনুষ্ঠান বৃদ্ধি: পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় সহায়তা করা এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা করা উচিত। এক্ষেত্রে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও

উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধে নানাবিধ প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও পন্থা বের করা সম্ভব।

পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান যথা সভা, সেমিনার, আলোচনা, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক, দিবস পালন ইত্যাদি বেশি বেশি আয়োজন করা প্রয়োজন। কারণ এ বিষয়ে যত বেশি আলোচনা ও প্রচার-প্রচারণা হবে, মানুষকে তত বেশি সচেতন করে তোলা সম্ভব হবে। পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। প্রত্যেক বছর একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য নিয়ে দিবসটি পালিত হয়, যেমন এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'Inspired by Nature. For Climate. For Our Future.'- যার বাংলা ভাবানুবাদ হচ্ছে 'প্রকৃতি থেকে অনুপ্রেরণায়। জলবায়ুর জন্য। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য।' অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সকলকে সচেতন ও অনুপ্রাণিত হতে হবে। আবার ২০২৫ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আন্তর্জাতিক প্রতিপাদ্য ছিল 'Ending Plastic Pollution' (প্লাস্টিক দূষণের অবসান ঘটানো)। তবে বাংলাদেশে দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য মূলভাব বা স্লোগানের প্রতিপাদ্য ছিল- 'প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়'।

তবে পুরো বছরে মাত্র একদিন পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করে যদি সারাবছর আমরা পরিবেশ রক্ষায় উদাসীন থাকি তাহলে আমাদের অস্তিত্ব ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে।

পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকা: বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরিবেশ সংরক্ষণকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানপূর্বক বাংলাদেশের সংবিধানে পরিবেশ বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে সুস্থ পরিবেশকে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এছাড়া সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেছে ও তার বাস্তবায়ন করতে সদা সচেষ্ট। বাংলাদেশ পরিবেশ রক্ষায় প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন হলো বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, যা প্রধান আইন। এই আইনের পাশাপাশি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এবং পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ কার্যকর রয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষায় প্রণীত অন্যান্য সুনির্দিষ্ট এবং সহায়ক আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ❑ বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য প্রণীত।
- ❑ ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯): বায়ু দূষণ রোধে ইটভাটার নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্সিং সংক্রান্ত আইন।
- ❑ বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩: পানি সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও দূষণ রোধে কার্যকর।
- ❑ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০: পরিবেশ আদালত গঠন, ক্ষতিপূরণ আদায় এবং কঠোর শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ❑ খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০: শহরাঞ্চলে পরিবেশ রক্ষায় উন্মুক্ত স্থান ও জলাধার সংরক্ষণ।

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আইনগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারলে দেশে পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে গণমাধ্যমের ভূমিকা: গণমাধ্যমকে সমাজের আয়না বলা হয় যেখানে দেশ ও সমাজের নানারকম অসঙ্গতি, অন্যায় আর অপকর্ম তুলে ধরে সেগুলো প্রতিরোধে জোরালো ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমসমূহ সরকারের জন্য ন্যায়পালের ভূমিকা পালন করে। একইভাবে পরিবেশ রক্ষায় জনগণকে সচেতন করতে এবং সরকারের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

অবশেষে বলা যায়, পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সচেতনতা, দায়িত্বশীল আচরণ এবং সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই একটি সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। আসুন, সকলে মিলে পরিবেশ দূষণ রোধ করি, প্রিয় পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করি আর রক্ষা করি প্রাণিকুল আর মানবজাতি।

তথ্যসূত্র

১। পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের ভূমিকা, মোঃ রোনাকে জাহান, https://www.teachers.gov.bd/blog/details/825946

২। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আমাদের করণীয়, শ্যামা সরকার জুন ৯, ২০২১, ১২:০১:০৪

https://www.newsg24.com/feature-news/6257//

৩। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আমাদের করণীয়, মো. নজরুল ইসলাম

https://www.amaderbarta.net/bn/news/world-enviro nm nt-day-and-what-we-can-do-332527

৪। বিশ্ব পরিবেশ দিবস; আমাদের করণীয় ও প্রত্যাশা, মোহাম্মদ আলী https://bartabazar.com/news/54951/

৫। https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/ nature-and-environment/105555/

৬। https://bangladesh.un.org/bn/297772-

মুহা. শিপলু জামান, পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশনা), ডিএফপি

নজরুলের *শিউলিমালা* গল্পগ্রন্থ: প্রেম ও দ্রোহের মিশ্রণ

ড. আশরাফ পিন্টু

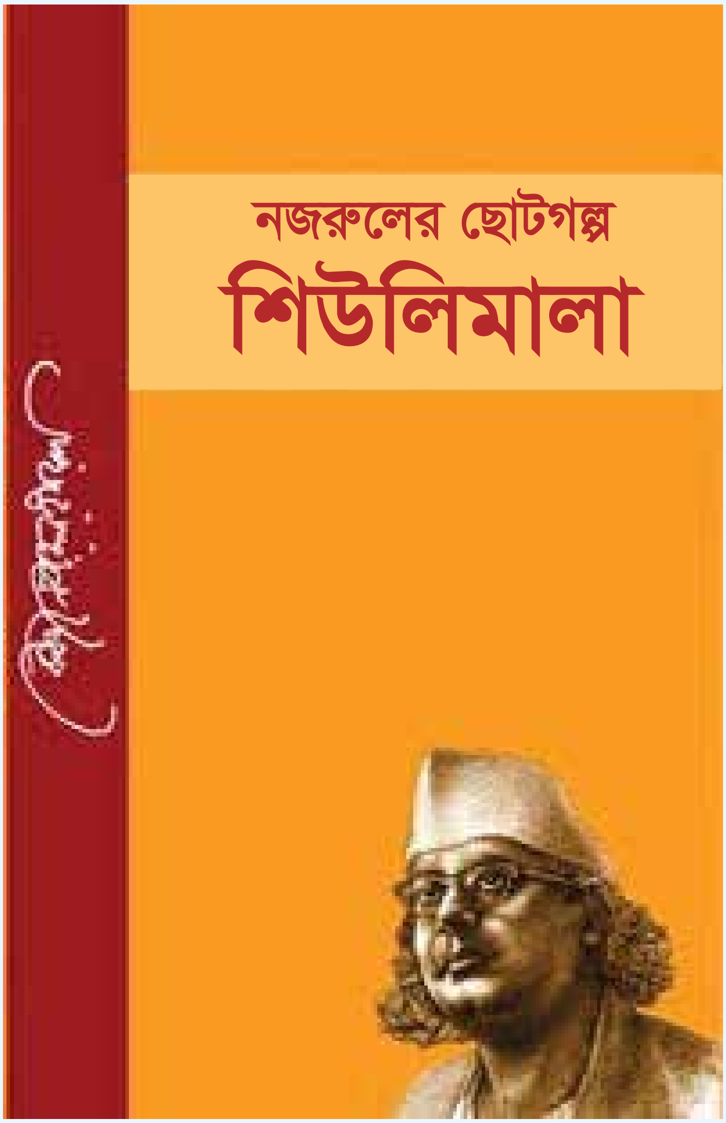

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় বলেন, ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।’ এখানে একই সঙ্গে তিনি রুদ্র ও প্রেমের প্রতীক। বিদ্রোহ যাঁর কবিতা ও সমাজচৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গল্পে তিনিই আবার রচনা করেন এক মহান বৈপরীত্য। নজরুলের গল্পে পাওয়া যায় বিরহী প্রেমের এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। তিনি কবির প্রতিভায় বেঁধেছেন তাঁর গল্পের রশি। নজরুলের আবেগবহুল গল্পসমূহ প্রেমবোধে শিখরস্পর্শী, যা আমাদের চৈতন্যলোককে নাড়া দিয়ে যায়।

কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি গল্পগ্রন্থের মধ্যে *শিউলিমালা* তৃতীয় তথা সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মোট ৪টি গল্প আছে। গল্পগুলো হলো: পদ্মগোখরো, জিনের বাদশা, অগ্নিগিরি, শিউলিমালা। ৪টি গল্পই স্বাতন্ত্র্য মহিমায় উদ্ভাসিত।

‘পদ্মগোখরো’ গল্পটিতে এক অদ্ভুত মাতৃত্বের গল্প এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। মায়ের ভালোবাসা ও মাতৃত্বের গভীর আকাঙ্ক্ষা এই গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। সেই সঙ্গে আছে উচ্চবংশীয় লোকের অধঃপতন আর ভণ্ডামি।

রসুলপুরের মির সাহেবদের আগে জমিদারি থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিলুপ্তি ঘটে। এখন দিন আনে দিন খায়’- এর মতো অবস্থা। তবুও যাদের জমিদারি থাকে, ইতিহাস ঐতিহ্যের দিক দিয়ে তারা বরাবরই এগিয়ে থাকে। অন্যদিকে বংশগৌরব থাকলেও সৈয়দ সাহেব ধীরে ধীরে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকেন। বাড়ির থালা-বাটি বিক্রি করে সংসার খরচ চালাতে হয়। তাই মির সাহেবের নাতির বিয়ের কথা উঠলে সৈয়দ সাহেব মেয়েকে বিয়ে দিতে কার্পণ্য করেন না।

‘পদ্মগোখরো’ গল্পের আরিফ আধুনিক মানবিক মানুষ, প্রেমিক মানুষ, চরম ধৈর্যশীল। সে জীবনে সহজে আঁতকে ওঠার মানুষ নয়, বিপদে দিশেহারা হওয়ার পাত্র নয়। অন্যদিকে জোহরা বেশ লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। মির বাড়িতে আসার পর তার স্বামী আরিফের ভাগ্য যেন খুলে যায়। নিতান্তই কৌতূহলবশত দেয়ালে ফাটল দেখতে পেয়ে গুপ্তঘর আবিষ্কার করে মেয়েটা। সেখানে পাওয়া যায় গুপ্তধন, যা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট। তবে বাধ সাধে অন্য বিষয়। সেই গুপ্তধনের কলসি জড়িয়ে আছে জোড়া পদ্মগোখরা সাপ। ওদের তাড়িয়ে দিলেও যায় না। জোহরার পেছনে পেছনে ঘুরে। দুধের বাটি দিলে সব খেয়ে নেয়। কিন্তু এভাবে ঘরজুড়ে দুই দুইটা সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলে ভয়ে থাকতে হয়।

‘পদ্মগোখরো’ গল্পে জোহরা এক মমতাময়ী মা। এক অসাধারণ মাতৃত্বের নজির স্থাপন করেছে এ গল্পে। নিজের দুইটি মৃত বাচ্চাকে মনে করেই সাপ দুটোর প্রতি জোহরার মমতা বাড়ে। সন্তানের জন্য একজন মায়ের মন কতটা অসহায়, কতটা উৎকণ্ঠায় দিন পার করে তার সুন্দর দৃষ্টান্ত এই গল্পটি। একই সঙ্গে লোভ-লালসার যে পরিণতি, তাকেও লেখক বেশ ভালোভাবেই উপস্থাপন করেছেন। এ পৃথিবীতে সব প্রাণীর

বাঁচার অধিকার আছে; অপ্রয়োজনে কোনো প্রাণ হরণ করা উচিত নয়– তাও ফুটিয়ে তুলেছেন এ গল্পে।

ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন এদেশীয় মির ও সৈয়দ উভয়ের পতন ও ধ্বংস নিশ্চিত করেছে। পিরবংশের লোক সৈয়দ সাহেব জামাতার কাছ থেকে টাকাপয়সার সাহায্য নেন না বহু অনুরোধের পরও। কিন্তু রাতের অন্ধকারে নিজ কন্যার অলংকার মাতা-পিতা যৌথভাবে চুরি করেছেন। কন্যার অলংকার চুরি করেই অপরাধ কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়নি, অধিকন্তু কৌশলে জামাতার খাদ্যে বিষও প্রয়োগ করেছেন। এটা পতনশীল ও পচনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য। এ গল্পে কাজী নজরুল ইসলাম ভণ্ডামির মুখোশও উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন– কন্যার স্বর্ণের অলংকার চুরি করে সেই টাকায় হজযাত্রা করে। সুতরাং এই 'পদ্মগোখরো' গল্পের মধ্যে আমরা কয়েকটি প্রধান দিক লক্ষ করতে পারি– উচ্চ বংশীয় সমাজের অধঃপতন আর ভণ্ডামি। এখানেই লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

'জিনের বাদশা' গল্পতে নজরুলের মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের প্রথম অংশে কিছুটা হাসির খোরাক থাকলেও গল্পটির সমাজ-মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বুদ্ধিদীপ্ত।

চুন্নু ব্যাপারী একজন মুসলমান ব্যাপারী ও চাষি। তার তিনটা বউ ও সাতটা ছেলে। এর মধ্যেও তৎকালীন মুসলিম সমাজের একটি চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রামীণ মুসলমান সমাজে তখন যে পুঁথির প্রভাব ছিল তাও এ গল্পে লেখক তুলে ধরেছেনে। গল্পের নায়ক আল্লারাখা নিজেকে সোনাভানের পুঁথির গাজি হানিফার সঙ্গে তুলনা করে। আল্লারাখা তেমন শিক্ষিত না হলেও তার সাহস বেশ। সে যতই দুরন্ত প্রকৃতির হোক না কেন তার হৃদয় কিন্তু প্রেমিক হৃদয়। নানাভাবে নানা উপায়ে সে তা প্রমাণ করেছে। গ্রামের বাউন্ডুলে ছেলেদের দলনেতা আল্লারাখা। সে জিনের বাদশা সেজে চানভানু নামের এক মেয়ের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। এদিকে আরেক গ্রামের ছেরাজ হালদারের সঙ্গে চানের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

গ্রামীণ কৃষক সমাজের মধ্যে প্রচলিত জিন-ভূতের ধারণার চমৎকার প্রয়োগ দেখিয়েছেন লেখক। তার সাথে এটাও দেখাতে চেয়েছেন যে, বাস্তবে জিন-ভূত বলতে কিছুই নেই; এটা হলো মানুষের কামনা-বাসনার অন্যরকম প্রকাশ। সমাজে সবসময়ে সকল পরিবেশে মানুষ সরাসরি সব বাসনার প্রকাশ ঘটাতে পারে না, তাই তাকে নানা কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করতে হয়। যেমন 'জিনের বাদশা' গল্পের নায়ক করেছে। তার আপাতকঠিন মনোভাবের ভেতরে লুকানো আছে দয়ালু প্রেমিক হৃদয়। 'জিনের বাদশা' হিসেবে নিজেকে আল্লারাখা যে উপস্থাপন করেছে তা হলো কৌশল। অন্যভাবে মনের ভাবপ্রকাশ যেখানে সরাসরি নিজেকে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, সেখানেই মানুষ এই কৌশলের আশ্রয় নেয়। মূলত জিন-ভূত হলো মানুষের অন্যরকম রূপ, অন্যরকম প্রকাশ।

'অগ্নিগিরি' একটি প্রেমের গল্প। নায়িকা নুরজাহানের গৃহশিক্ষক ত্রিশাল মাদ্রাসার ছাত্র সবুর। গল্পটি সরাসরি ত্রিশালের পটভূমিতে রচিত। স্থান, কাল, পাত্রপাত্রী, ভাষাসহ সবই ত্রিশালকেন্দ্রিক। এ গল্পে ত্রিশাল, বীররামপুর গ্রাম, ত্রিশাল মাদ্রাসা, নুরজাহান, রুস্তম, ময়মনসিংহ হাসপাতাল, ত্রিশাল থানাসহ ত্রিশালের আঞ্চলিক ভাষার উল্লেখ রয়েছে প্রায় পুরো গল্পজুড়েই।

'অগ্নিগিরি' গল্পের নায়ক সবুর আখন্দ ত্রিশাল মাদ্রাসার ছাত্র। সবুর আখন্দ সম্পর্কে নজরুল তাঁর গল্পে লিখেছেন, 'এরই বাড়িতে থেকে ত্রিশালের মাদ্রাসায় পড়ে সবুর আখন্দ। নামেও সবুর, কাজেও সবুর। শান্তশিষ্ট গোবেচারা মানুষটি। উনিশ-কুড়ির বেশি বয়স হবে না। গরিব ঘরের ছেলে দেখে আলি নসিব মিঞা তাকে বাড়িতে রেখে তার পড়ার সমস্ত খরচ যোগান।'

এ গল্পের নায়িকা নুরজাহান আলি নসিব মিঞার একমাত্র কন্যা। সবুর আখন্দ এ বাড়িতে লজিং থেকে ত্রিশাল মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে আর নুরজাহানকে উর্দু ও ফারসি পড়ায়। নুরজাহান ছিলেন সৎ, মেধাবী ও অপূর্ব সুন্দরী। সব সময় সৎ পথে চলত আর সত্য কথা ও উচিত কথা বলত। নজরুল নুরজাহানের রূপ ও অন্যান্য বিষয়ে 'অগ্নিগিরি' গল্পে সরাসরি বর্ণনা করেছেন, 'সবুর যতক্ষণ পর্যন্ত নুরজাহানকে পড়ায় ততক্ষণ একভাবে ঘাড় হেট করে বসে থাকে, একটিবারও নুরজাহানের মুখের দিকে তাকায় না। সত্য সত্যই, এই তিন বছর সবুর এই বাড়িতে আছে এর মধ্যে সে এক দিনের জন্যও নুরজাহানের হাত পা ছাড়া মুখ দেখেনি। এ নুরজাহান জাহানের জ্যোতি না হলেও বীররামপুরের জ্যোতি, জোহরা, সেতারা এ সম্বন্ধে কারও মতদ্বৈধ নাই।'

নুরজাহান সবুরকে ভালোবাসতো মনপ্রাণ উজাড় করে তবে নীরবে, একই অবস্থা সবুরেরও। কিন্তু কোনো দিন কেউ প্রকাশ করেনি কেউ কাউকে যে ভালোবাসে। নজরুল সবুর-নুরজাহানের অমর প্রেমের কাহিনিটি এমনভাবে অঙ্কন করেছেন যে তাদের ভালোলাগা-ভালোবাসার কথাটি উপস্থাপিত হওয়ার আগেই কোমল প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটে। নুরজাহান সবুরকে সারা জীবনের সাথি অমরসঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছিল কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কোনো এক দুর্ঘটনায় তার প্রেম-ভালোবাসাকে স্বচ্ছ কাঁচের মতো খান খান করে ভেঙে দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে একদিন রুস্তমের সঙ্গী আমির ছুরির আঘাতে প্রাণ হারালো আর ময়মনসিংহ কোর্টের হাকিম সবুরকে সাত বছরের কারাবাস ঘোষণা দেয়। তখন ভেঙে পড়ে নুরজাহান, তার বাবা আলি নসিব মিঞা আর মা। নজরুল ইসলাম 'অগ্নিগিরি' গল্পের সমাপ্তি টানতে গিয়ে লিখেছেন, তার পরদিন সকলে জেলে গিয়ে সবুরের সাথে দেখা করলেন। সবুর সব শুনল, তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। জামার হাতায় তা মুছে বলল, আব্বা, আম্মা আমি সাত বছর পর যাইবাম আপনাদের কাছে কথা দিতাছি? তারপর নুরজাহানের দিকে ফিরে বলল, আল্লাহ যদি এই দুনিয়ায়

দেখবার না দেয়, যে দুনিয়াতেই তুমি যাও আমি খুঁইজ্যা লইবাম। অশ্রুতে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হয়ে গেল, আর সে বলতে পারল না। নুরজাহান কাঁদতে কাঁদতে সবুরের পায়ের ধুলা নিতে গিয়ে তার দুফোটা অশ্রু সবুরের পায়ে গড়িয়ে পড়ল। বলল, তাই দোয়া কর। কারাগারের দুয়ার ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল– সেই দিকে তাকিয়ে নুরজাহানের মনে হলো তার সকল সুখের স্বর্গের দ্বার বুঝি বা চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গেল।

'অগ্নিগিরি' শুধু প্রেমের গল্পই নয়, এটি একটি প্রতিবাদী গল্পও বটে। মানুষের সহ্যের একটা সীমা থাকে, একটা সময় থাকে। এক সময়ে সে প্রতিবাদী হয়, সংগ্রামী হয়। সে কথাই লেখক এখানে দেখিয়েছেন মাদ্রাসা ছাত্র সবুরের মাধ্যমে। এ গল্পে লেখক দেখাতে চেয়েছেন, প্রেমই মানুষকে সাহসী করে, প্রতিবাদী করে। সমাজের প্রথাগত ধারণা, গরিব অনগ্রসর পরিবারের ছেলেরাই সাধারণত মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে। তারা বোকা ধরনের হয়। লেখক জানাচ্ছেন, পাড়ার ছেলেদের অধিকাংশই স্কুলের পড়ুয়া। কাজেই তারা মাদ্রাসাপড়ুয়া ছেলেদের বোকা মনে করে। দেশের মানুষ ধীরে ধীরে প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। শুধু স্কুল-কলেজের ছাত্ররা নয়, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মাদ্রাসার ছাত্ররাও হঠাৎ মারমুখী হয়ে উঠেছে; অন্যায়, অবিচার, জুলুম-দুঃশাসন লোকে আর হজম করছে না। মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্র সবুর প্রতিবাদী হওয়া মানে সমাজের অনগ্রসর মানুষের জেগে ওঠার কাহিনি। সবুর হয়ে উঠেছে সমাজের প্রতিরোধের প্রতীক।

নজরুলের বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া একটি প্রেম উপাখ্যানের ছায়াতেই রচিত হয়েছে 'অগ্নিগিরি' গল্প। মুনির চৌধুরী তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "নজরুল অতীতকে স্মরণ করেছেন বর্তমানকে পুনঃনির্মাণের হাতিয়ার রূপে। কবি নজরুল *শিউলিমালা* অমর গল্পগ্রন্থের 'অগ্নিগিরি' গল্পে দুটি অবুঝ সহজ সরল মনের গভীর প্রেমের কথা, ত্রিশালের আঞ্চলিক ভাষায় ও শব্দের নিখুঁত টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছেন। যা পড়ে মনে হয় নজরুল তাঁর জীবনের কিছু অংশ এ গল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন অত্যন্ত কৌশলে ও আন্তরিকতার সাথে।"

শিউলিমালা গল্পগ্রন্থের শেষ গল্পের নাম 'শিউলিমালা'। 'শিউলিমালা' গল্পটি একেবারে নির্ভেজাল প্রেমের গল্প। নজরুলের প্রতিটি গল্পের সুর এক, বেদনা এক– সবই যেন একই সুতোয় গাঁথা। কালে কালে যে প্রেম মহীয়ান হয়ে ওঠে তার রূপ এতে অঙ্কিত। তাই অতৃপ্তির তৃষ্ণাতেই তিনি এঁকে দেন জয় তিলক। মরবে জেনেও পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে আলোকের প্রত্যাশায়। এ গল্পের নায়কও প্রেম রূপ অনলে আপনাকে সমর্পণ করে।

কলকাতার তরুণ ব্যারিস্টার আজহার। দাবাখেলায় পারদর্শী সে। দেশ-বিদেশের বহু নামকরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে সে দাবা খেলেছে। শিলংয়ে বেড়াতে এসে প্রফেসর চৌধুরীর বাড়িতে সে বন্ধুবান্ধবসহ একদিন আতিথ্য গ্রহণ করে। দাবাখেলার পর বসে গানের আসর। প্রফেসর কন্যা শিউলির ঠুংরি টপ্পা মেশানো স্বতঃস্ফূর্ত গানের সুর শুনে বিমুগ্ধ হয় আজহার। প্রফেসর চৌধুরীর অনুরোধে সপ্তাহখানেক পর হোটেল ছেড়ে তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয় আজহার। তার নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গী হয়ে ওঠে প্রফেসর চৌধুরীর মেয়ে শিউলি। রোজ দাবাখেলা, আড্ডা ও সংগীতে মুখরিত হয় বাড়ির অন্দরমহল। এ পরিবারের সঙ্গে বেশ কিছুদিন স্বপ্নের মতো কেটে যায় তার। শিউলির চোখে চোখ রেখে এক দারুণ মোহজালে আবিষ্ট হয়ে থাকে আজহার। কিন্তু পরস্পরের মন জানাজানি হলেও কোনো এক অনির্দেশ্য মনস্তত্ত্বে তাকে একান্তে পাবার অবকাশ হয়নি তার। কিন্তু স্বপ্নের মতো দিনগুলো ফুরিয়ে গেছে নিজের অজান্তেই। আজহার টের পায়– তার মনে অলক্ষ্যেই বাসা বেঁধেছে শিউলি। এটা আরো স্পষ্ট হয় শিলং ছাড়ার প্রাক্কালে। মেশামিশিতে নিষেধের বালাই ছিল না বলেই পরস্পরের হস্তস্পর্শটুকুও লাগেনি। সেখানে এই তীব্র মুক্তিই হয়ত ছিল তাদের পরস্পরের মিলবার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য ও অনির্দেশ্য বাধা।

আজহারের যাবার বেলায় একগুচ্ছ শিউলিফুল নিয়ে হাজির হয় শিউলি। কিন্তু অসহায় চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া আজহারের আর কিছুই যে করার নেই! যাবার সময় একবার দাবাখেলার আসর হলো প্রফেসর চৌধুরীর ইচ্ছায়। দাপুটে খেলোয়াড় আজহার শিউলির সঙ্গে হেরে গেল আজ। জীবনে প্রথম ও শেষবারের মতো দাবার এই হার তার জন্য। হয়ত জীবনের সঙ্গেই হেরে যাওয়া তা। অপূর্ণতার বার্তা এই হারবার সংকেতে। শিউলির সঙ্গে আজহারের আর দেখা হয়নি কোনোদিন। কিন্তু তখন থেকে প্রতি শরৎ-সন্ধ্যায় একখানি শিউলিফুলের মালা জলে বিসর্জন দেয় সে।

নজরুলের অন্য গল্পের চেয়ে 'শিউলিমালা' গল্প নানাভাবে আলাদা– ভাষায় ও ভাবে। এ গল্পের ছোটো-বড়ো সব চরিত্রই শিক্ষিত উঁচুতলার। তাদের আলাপের বিষয়, ভাবনার বিষয়, চিন্তার বিষয় সবই আলাদা। এতে আমরা আমাদের সমাজের একটা ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই।

পরিশেষে বলা যায়, নজরুলের প্রতিটি গল্পের মধ্যে নিহিত আছে প্রেম-ভালোবাসার পাশাপাশি একটা রাজনৈতিক দর্শন। জাগরণের বাণী। প্রতিরোধের আগুন। ভারতীয় উপমহাদেশের চরম সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেও তিনি পরম অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। নিজেকে তিনি সর্বদা জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে রেখেছেন। তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল মানবেতর ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি। তাঁর ভাবনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঙালির জন্যে তৈরি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি বিরাট ঠিকানা। এক্ষেত্রে নজরুল বাংলা সাহিত্যে অনন্য ও অদ্বিতীয়।

ড. আশরাফ পিন্টু: কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা, মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বেড়া, পাবনা, ashrafpintu.sonon@gmail.com

পাবলিক সার্ভিস দিবসঃ উন্নয়ন ও জনসেবার সেতুবন্ধ

প্রফেসর ড. সবুজ শামীম আহসান

পাবলিক সার্ভিস ধারণাটি সুপ্রাচীন। প্রাচীন মিশর, চীন ও জার্মানিসহ অনেক দেশেই এ প্রত্যয়টির কার্যক্রম বিদ্যমান ছিল। সপ্তাদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে এবং বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে পাবলিক সার্ভিসের যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে পাবলিক সার্ভিসের সূচনা হয়। বাংলাদেশে পাবলিক সার্ভিস প্রশাসনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, জনসেবা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার মানসে এর কর্মপরিধিও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম ও অর্থনীতি চর্চার পাশাপাশি জনপ্রশাসন বা পাবলিক সার্ভিসের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।[১] পাবলিক সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই আধুনিক সমাজে প্রশাসন ব্যবস্থাকে সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র বলে আখ্যায়িত করা হয়।[২]

পাবলিক সার্ভিস হলো সর্বসাধারণের জন্য এক প্রকার পেশাদারি সেবা। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো পাবলিক সার্ভিস। দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, নীতি, কর্মসূচি এবং সিদ্ধান্তগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে পাবলিক সার্ভিসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক কথায় পাবলিক সার্ভিস বলতে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। পাবলিক সার্ভিসের জন্য জনগণ নয়, বরং জনগণের জন্যই পাবলিক সার্ভিস।[৩] সরকারি কর্মকর্তা রাষ্ট্রের কর্মচারী– বাংলাদেশের সংবিধান তাই বলে। পাবলিক সার্ভিসের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে বিভিন্নভাবে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা এবং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।[৪] মানুষের কল্যাণে নীতি প্রণয়ন এবং নীতি বাস্তবায়নই হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস। বর্তমানে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণের প্রধান মাধ্যম হলো কার্যকর পাবলিক সার্ভিস। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, সমাজসেবা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সুশাসন, তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ, কৃষি, সামাজিক সুরক্ষা, সম্পদের সদ্ব্যবহার, মৌলিক ও মানবিক অধিকার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং উন্নয়নমূলক সেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজটি করে থাকে পাবলিক সার্ভিস। পাবলিক সার্ভিস রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির সাথে জড়িত এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাগত দিক। পাবলিক সার্ভিসের চরিত্র আইনগত, এটি সর্বদা নির্ধারিত আইন অনুযায়ী কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। পাবলিক সার্ভিস সর্বদাই আইন মেনে চলে এবং আইন বহির্ভূত কোনো কাজ সম্পন্ন করে না।[৫] সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।[৬] তাহলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, পাবলিক সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ জনগণের সেবক।

২০০২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩শে জুনকে আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস ডে হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘ মেধাবী তরুণ জনগোষ্ঠীকে পেশা হিসেবে পাবলিক সার্ভিসকে বেছে নিতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ দিবসটি পালন করে থাকে।[৭]

জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী দিবসটিকে ঘিরে তাদের কার্যক্রম তাদেরই অফিসগুলোতে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করে থাকে। বৈশ্বিক সংকটসমূহের মাঝেই উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে তৎপরতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৯৩টি দেশই আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস পালন করে থাকে। বাংলাদেশও ২০১৬ সাল থেকে সরকারি কর্মচারীদের উদ্ভাবনী ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস পালন করে আসছে। জাতিসংঘ ২৩শে জুন এ দিবসটি পালন করলেও বাংলাদেশ দিবসটি পালন করে ২৩শে জুলাই। বাংলাদেশ সরকার এ দিবসটিকে ‘খ’ শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে গুরুত্বের সাথে পালন করে।[৮]

একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া সামাজিক ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। সুশাসন এমন একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা যা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, আইনের শাসন এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এর মূল লক্ষ্য হলো দুর্নীতিমুক্ত ও জনবান্ধব প্রশাসনের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও সঠিক কল্যাণ সাধন করা। আর সুশাসনের জন্য গণতন্ত্র অপরিহার্য।[৯]

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পাবলিক সার্ভিসের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পাবলিক সার্ভিস হচ্ছে সে সব কার্যক্রমের সমষ্টি যা সরকারি নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসেবার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।[১০] এর ফলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, পাবলিক সার্ভিস বলতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনগণের সেবা বা কল্যাণের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমকে বোঝায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় সরকার, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা দিকে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। একটি কার্যকর পাবলিক সার্ভিস জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে এবং রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যায়।

এ দিবসের মূল উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন: এ দিনে জনপ্রশাসনের সবচেয়ে সৎ ও যোগ্য কর্মীদের কাজের আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন করা। মোটকথা যে সকল কর্মকর্তা জনগণের কাজকে নিজের কাজ মনে করে জনকল্যাণে নিমজ্জিত থাকে তাদের সম্মান করা।

গতিশীলতা: সরকারি কর্মচারীদের আরও বেশি জনমুখী, আন্তরিক এবং সংকটে দ্রুত সাড়াদানকারী হিসেবে গড়ে তোলা।

পদক প্রদান: সরকারি কর্মচারীদের সৃজনশীল ও প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর এ দিনে জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা।

জনসেবার গুরুত্ব তুলে ধরা: রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারি সেবার অবদান জনসম্মুখে তুলে ধরা। অর্থাৎ জনকল্যাণে সরকার কী কী কাজ করেছে এবং এ কাজে জনগণের কী লাভ তা উল্লেখ করা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা: স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে জনগণকে জানানো।

নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করা: যুবসমাজ যাতে দেশ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারি চাকরিতে আগ্রহী হয় তার ব্যবস্থা করা।

টেকসই উন্নয়ন: দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি সেবার ভূমিকা তুলে ধরা।

জনমতকে প্রাধান্য দেওয়া: সাধারণ জনগণের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।

নীতি প্রণয়ন: নীতি প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়নে সর্বদা গুরুত্ব দেওয়া।[11]

জবাবদিহি: জনগণের নিকট সবকিছুতেই জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

প্রশাসনের প্রতি মানুষের ভয় দূরীকরণ: সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আমাদের দেশের মানুষ প্রশাসনের প্রতি এক প্রকার ভয় ও অনীহা লালন করে আসছে। এ দিবস পালনের মাধ্যমে প্রশাসনকে জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে তুলে ধরা।

ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ: [12] ভেজাল খাবারের ফলে স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতার ঝুঁকি বাড়ছে। শিশুসহ সকল শ্রেণির মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এ দিবসটির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মোটকথা জনজীবনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এ দিবসের মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ সরকারি সেবাসমূহ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়াই এ দিনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।[13]

পাবলিক সার্ভিস দিবস পালনের প্রাসঙ্গিকতা

পাবলিক সার্ভিস দিবস সরকারি কর্মচারীদের মানব কল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতি প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য। দেশের কল্যাণে নীতিনির্ধারণ ও নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাবলিক সার্ভিস যেহেতু মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের হৃৎপিণ্ড, সেহেতু এর গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিককালে পাবলিক সার্ভিসকে একটি সুসংঘবদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়।[14] রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে দেশের প্রতিটি অফিস থেকে সেবা, সহযোগিতা, ভালো ব্যবহার ও তথ্য পাওয়ার অধিকার জনগণের আছে। তাই এ দিবস পালনের মাধ্যমে জনগণকে এসব কথা জানানো হয়। ফলে মানুষ সরকারি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা পায়। এ দিবসে জনসাধারণকে বোঝানো হয় এ দেশ আপনার। এ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোও আপনার। সেবা পাওয়ার অধিকারও আপনার। এ দিবস পালনের তাৎপর্য অপরিসীম। পাবলিক সার্ভিস দিবসের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো:

উদ্ভূত সমস্যার সমাধান: আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। তাই সর্বদা কর্মকর্তাগণ জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকেন। সাধারণ মানুষ ঘরে বসেই রাষ্ট্রের সেবা নেন এবং সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

গণতন্ত্রের বিকাশ: গণতন্ত্রের বিকাশে পাবিলক সার্ভিস দিবস পালনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গণতন্ত্রের সফলতা, উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ, সৎ ও দক্ষ প্রশাসন। পাবলিক সার্ভিস দিবসে দক্ষ প্রশাসক বা কর্মচারীদের পুরস্কৃত করা হয়, ফলে গণতন্ত্র বিকশিত হয়।

শিক্ষার উন্নয়ন: শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার উন্নয়ন মানে জাতির উন্নয়ন। পাবলিক সার্ভিস শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ, শিক্ষা বৃত্তি, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। ফলে জনগণের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত হয়।

স্বাস্থ্যসেবা: জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে এ দিবসের গুরুত্ব অনেক। সরকারি হাসপাতালে গরিব রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ ও চিকিৎসাসেবা প্রদান, টিকাদান কর্মসূচি প্রভৃতির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা হয়।

কৃষিসেবা : পাবলিক সার্ভিস দিবসে জনগণকে বলা হয়, কৃষির উন্নয়নে কৃষকদের বিনাসুদে ঋণ প্রদান, সার ও কীটনাশক ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান, সরকারিভাবে ধান-চালসহ অন্যান্য ফসল ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করা সরকারের দায়িত্ব। এর ফলে কৃষকেরা কৃষিকাজে মনোযোগী হন। ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

কৃষ্টি ও সভ্যতা এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ: পাবলিক সার্ভিস দেশের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতা সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। পাবলিক সার্ভিস সামাজিক কৃষ্টির অংশ হিসেবে গণ্য।[15] তাই পাবলিক সার্ভিস নানা ধরনের নীতি ও নির্দেশনা জারির মাধ্যমে দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতা রক্ষা করে রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

যুদ্ধ ও দুর্যোগ মোকাবিলা: অতিমারি, মহামারি, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগে পাবলিক সার্ভিস দ্রুত উদ্ধার ও পুনর্বাসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

সংসদের সম্মতি ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না।[১৬] সর্বোপরি যুদ্ধ মোকাবিলায়ও পাবলিক সার্ভিস ভূমিকা রাখে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা: আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নের ওপর জাতীয় উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই পাবলিক সার্ভিস প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার: দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস জনকল্যাণ নিশ্চিত করে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: সরকার জনগণের কল্যাণে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তাবায়নে পাবলিক সার্ভিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৭]

প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি: প্রশাসনের প্রতি দীর্ঘদিন থেকে মানুষের আস্থার সংকট রয়েছে। তাই প্রশাসন জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু– এ কথা প্রমাণিত করবার জন্য পাবলিক সার্ভিস দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সরকারি কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান: যে সকল সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা বা কর্মচারী দেশের উন্নয়নে তথা জনকল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করেন তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জনপ্রশাসন পুরস্কার প্রদান করা হয়। ফলে কর্মচারীগণ উৎসাহিত হন এবং জনসেবায় আরও মনোযোগী হন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা: সুশাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া দেশের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন সুশাসনের ভিত্তি। পাবলিক সার্ভিস দিবস প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নৈতিকতার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে দুর্নীতিমুক্ত জনমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গতিশীলতা: সরকারি কর্মচারীরা কাজে গতিশীল হলে সেবার মান উন্নয়ন হয়। পাবলিক সার্ভিস দিবসে কর্মচারীদের গতিশীলতার কথা বলা হয়।

সম্পর্ক উন্নয়ন: জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। এ দিবস কর্মকর্তাদের জনগণের সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদ্ভাবন ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ: বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। কাঙ্ক্ষিত জনসেবা নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ব্যবহার অপরিহার্য। পাবলিক সার্ভিস দিবস আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন গঠনে গুরুত্ব দেয়। যার ফলে দ্রুততম সময়ে জনসেবা নিশ্চিত হয়।

মানবিক প্রশাসন: মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মানবিক প্রশাসন অত্যাবশ্যক। দেশের বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে সরকারি কর্মচারীদেরকে মানবিক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন: দুর্নীতি জনসেবার পরিপন্থি। তাই এ দিবসে কর্মচারীদের সততার সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এর ফলে জনসেবা নিশ্চিত হয়।

বাংলাদেশ একটি জনকল্যাণকামী দেশ। রাষ্ট্রের জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যে পাবলিক সার্ভিসের কোনো বিকল্প নেই। পাবলিক সার্ভিস দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দেশের উন্নয়ন জনকল্যাণে নিহিত। পাবলিক সার্ভিস ও জনসেবা একই সূত্রে গাথা। প্রশিক্ষিত, মানবিক ও সৎ প্রশাসন ছাড়া রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। পাবলিক সার্ভিস হলো জনসেবায় নিয়োজিত সুদক্ষ প্রশাসন। আর সরকারি সেবা যদি আরও প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব করা যায় তাহলেই এ দিবসের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। পাবলিক সার্ভিস হোক জনগণের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক। সরকারি-বেসরকারি সব অফিস হোক সততা আর নিষ্ঠার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা। সর্বোপরি কর্মকর্তাগণ মানবিকমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জনসেবাকে যদি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন, তবেই পাবলিক সার্ভিস দিবস পালন সার্থক হবে।

তথ্যসূত্র

১. প্রফেসর ড. রবিউল ইসলাম, লোক *প্রশাসন পরিচিতি*, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৬, পৃ. ৫।

২. প্রফেসর এস.এম. মো. নূর নবী, *লোক প্রশাসনের ভূমিকা*, লেখাপড়া, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ১।

৩. *দৈনিক দেশ রূপান্তর*, ৩রা জুন, ২০২৬।

৪. পূর্বোক্ত, প্রফেসর এস.এম. মো. নূর নবী, পৃ. ৬।

৫. ড. মো. নূরুল ইসলাম, *সামাজিক গবেষণা*, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৩।

৬. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান*, ২১(২) অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগ, ২রা মে, ২০০০ খ্রি, পৃ. ৬।

৭. *দৈনিক সমকাল*, ২৩শে জুন, ২০২৪।

৮. *জাগো নিউজ* ২৪, ২৩শে জুলাই, ২০২২।

৯. ড. মো. আবদুল হক তালুকদার, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম*, মাদার্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা, মে, ২০১৬, পৃ. ৬৩৬।

১০. মো. শহীদুল্লাহ, *সামাজিক প্রশাসন*, গ্রন্থকুটির, ঢাকা জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ২৪।

১১. পূর্বোক্ত, মো. শহীদুল্লাহ, পৃ. ২৫।

১২. *দৈনিক প্রথম আলো*, সেবা ও সততায় জনপ্রশাসন, মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী, ২৩শে জুন, ২০১৩।

১৩. *ঢাকা টাইমস২৪*, ২৩শে জুলাই, ২০২৩।

১৪. পূর্বোক্ত, প্রফেসর এস.এম. মো. নূর নবী, পৃ. ৪৫।

১৫. সালাম, লোকমান, নজরুল, *লোক প্রশাসন পরিচিতি*, এন এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, মার্চ ২০১২, পৃ. ১৬।

১৬. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান*, ৬৩(১) অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগ, ২রা মে, ২০০০ খ্রি, পৃ. ২৩।

১৭. পূর্বোক্ত, সালাম, লোকমান, নজরুল, এন এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, মার্চ ২০১২, পৃ. ১৬।

প্রফেসর ড. সবুজ শামীম আহসান: কবি, আবৃত্তিশিল্পী, সংগঠক ও বিভাগীয় প্রধান, সমাজকর্ম বিভাগ, যশোর সরকারি সিটি কলেজ, যশোর

বৃক্ষরোপণেই টেকসই বাংলাদেশের নতুন দিগন্ত

মিজানুর রহমান মিথুন

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বৃক্ষ। বৃক্ষ কেবল পরিবেশের শোভা বাড়ায় না, বরং এটি মানবজীবনের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম প্রধান উপাদান। অথচ আধুনিক সভ্যতার বিকাশ, নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং অবৈধভাবে বনভূমি ধ্বংসের কারণে আজ পৃথিবীজুড়ে বৃক্ষের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশও এই সংকট থেকে মুক্ত নয়। বরং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হওয়ায় বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা এখানে আরও বেশি।

এই বাস্তবতায় বর্তমান সরকার দেশজুড়ে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনি অঙ্গীকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বন বিভাগ ইতোমধ্যেই ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পে বলা হয়েছে, দেশের প্রতিটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণকে ৬টি খাতে ভাগ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা প্রমাণ করে যে, বৃক্ষরোপণ এখন আর কেবল আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নয়, বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল।

একটি গাছ শুধু ছায়া দেয় না, বরং এটি অক্সিজেন সরবরাহ করে, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। একই সঙ্গে বৃক্ষ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশকে শীতল রাখে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার অন্যতম কারণ হলো বনভূমির ধ্বংস। তাই এই সংকট মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এরই মধ্যে দৃশ্যমান। ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ও লবণাক্ততার বৃদ্ধি দেশের পরিবেশ ও অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি কমাতে বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় অঞ্চলে গাছ প্রাকৃতিক প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে, যা জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বন এক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ। যদি দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করা যায়, তাহলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।

বৃক্ষ মাটি সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বৃক্ষের শিকড় মাটিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে, ফলে ভূমিক্ষয় কমে যায়। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় বৃক্ষ নিধনের ফলে ভূমিধসের ঘটনা বেড়ে

যায়, যা মানুষের জীবন ও সম্পদের জন্য বড়ো হুমকি। তাই পাহাড়ি অঞ্চলে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ জরুরি।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও বৃক্ষ অপরিহার্য। পৃথিবীর অসংখ্য প্রাণী, পাখি ও কীটপতঙ্গ বৃক্ষের ওপর নির্ভরশীল। বনভূমি ধ্বংস হলে এসব প্রাণী তাদের আবাসস্থল হারায় এবং অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এতে করে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং খাদ্যচক্রে বিপর্যয় ঘটে। তাই বৃক্ষরোপণ মানে শুধু গাছ লাগানো নয়, বরং এটি পুরো একটি বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব অপরিসীম। বনজ ও ফলদ বৃক্ষ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কাঠ, ফল, ঔষধি গাছ এবং অন্যান্য বনজ সম্পদ মানুষের জীবিকানির্বাহে সহায়তা করে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৃক্ষরোপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কৃষকরা যদি তাদের জমির পাশে বা পতিত জমিতে গাছ লাগান, তাহলে তারা অতিরিক্ত আয় করতে পারবেন। একই সঙ্গে এটি দারিদ্র্য বিমোচনেও সহায়ক হবে।

নগরায়ণের ফলে শহরাঞ্চলে পরিবেশগত সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির মতো সমস্যাগুলো শহরের মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। এই পরিস্থিতিতে শহরে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরি। রাস্তার পাশে, পার্কে এবং খোলা জায়গায় গাছ লাগানোর মাধ্যমে শহরের পরিবেশ অনেকটা উন্নত করা সম্ভব। গাছ বায়ুদূষণ কমায়, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করে।

বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো সঠিক পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। অনেক সময় দেখা যায়, বিভিন্ন কর্মসূচিতে গাছ লাগানো হলেও পরবর্তীতে সেগুলোর যথাযথ পরিচর্যা করা হয় না। তাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি গাছের দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমান সরকারের ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে এটি দেশের পরিবেশ ও অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটাতে পারে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করা সহজ হবে। একই সঙ্গে এটি দেশের মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

এই কর্মসূচি সফল করতে হলে সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। প্রত্যেক নাগরিক যদি নিজের দায়িত্ব হিসেবে অন্তত একটি গাছ লাগায় এবং তার যত্ন নেয়, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ সবুজে ভরে উঠবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে, যাতে শিক্ষার্থীরা ছোটোবেলা থেকেই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়।

বেসরকারি সংস্থা, সামাজিক সংগঠন এবং গণমাধ্যমও এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা গেলে বৃক্ষরোপণ একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হতে পারে। একই সঙ্গে আইনগত ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, যাতে নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করা যায়।

বৃক্ষরোপণের সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কোথায় কোন ধরনের গাছ লাগানো উচিত, তা নির্ধারণ করা সম্ভব। একই সঙ্গে স্যাটেলাইট ও ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে বনভূমির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, বৃক্ষরোপণ কোনো বিলাসিতা নয়, বরং এটি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম শর্ত। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, বাসযোগ্য ও সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে এখনই আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারের ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এই পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সবুজ বাংলাদেশ গড়ার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করি। গাছ লাগাই, গাছ বাঁচাই এবং আমাদের প্রিয় দেশকে আবারও সবুজে ঘেরা একটি নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করি।

মিজানুর রহমান মিথুন: সিনিয়র সহ-সম্পাদক, জাগোনিউজ২৪.কম, ঢাকা, munshi.mithun@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৭ই জুন ২০২৬ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে ভিক্টোরিয়া স্কুল মাঠে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন-পিআইডি

বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

মো. মামুন অর রশিদ

জীবনের সংকটময় মুহূর্তগুলো সাধারণত পূর্বাভাস দিয়ে আসে না। একদিন যে মানুষটি পরিবারের উপার্জনকারী ছিলেন, বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে তিনিই হয়ে যেতে পারেন নির্ভরশীল। যে নারী একসময় স্বাভাবিক সংসারজীবন কাটিয়েছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর তিনিই পড়তে পারেন চরম অনিশ্চয়তায়। এমন সংকটময় মুহূর্তে নাগরিকের পাশে দাঁড়ানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সেই দায়িত্ব পালনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার জনগণের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। নির্বাচনি ইশতেহারের মাধ্যমে জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিই সরকারের নীতিনির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনার মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। যে নির্বাচনি ইশতেহার দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছে, সেই ইশতেহারে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। সেই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

বর্তমানে দেশের প্রায় ৪ কোটি ১৭ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। দেশের প্রায় ৫৩ লাখ বিধবা নারী, ৪৬ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ঋণগ্রস্ত অসংখ্য পরিবার, দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এবং খাদ্য-নিরাপত্তাহীন মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও সময়োপযোগী করা প্রয়োজন। এই বাস্তবতা বিবেচনায় সরকার একটি মানবিক, মর্যাদাভিত্তিক ও টেকসই সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হলো 'ফ্যামিলি কার্ড'। এর মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারকে নিয়মিত সহায়তার আওতায় আনা। এই কর্মসূচির আওতায় পরিবারের নারীপ্রধানকে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান করা হচ্ছে। এটি পরিবারে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই কার্ডের মাধ্যমে সরকার পরিবার প্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের দুই দিন পর অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারি 'ফ্যামিলি কার্ড প্রদান-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' গঠন করে। এরপর গত ১০ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত (১০ই জুন ২০২৬) ৬০ হাজার পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান করা হয়েছে। ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বাজেটে সরকার 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচির আওতায় ৪১ লাখ নারীকে মাসে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করবে।

সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হলো 'কৃষক কার্ড'। এর মাধ্যমে কৃষকরা ন্যায্য মূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক, সরকারি ভরতুকি ও প্রণোদনা এবং স্বল্পমূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি স্বল্প ব্যয়ে সেচ সুবিধা, সহজ শর্তে কৃষিঋণ, কৃষি বিমা সুবিধা, ন্যায্য মূল্যে কৃষি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৪ই এপ্রিল ২০২৬ টাঙ্গাইলের শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃষকের হাতে কৃষক কার্ড ও গাছের চারা তুলে দেন– পিআইডি

পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়া যাবে। গত ১৪ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান 'কৃষক কার্ড' বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। প্রি-পাইলটিং পর্যায়ে সারাদেশে এ পর্যন্ত (১০ই জুন ২০২৬) ২০ হাজার ৭৪৮ জন কৃষককে 'কৃষি কার্ড' প্রদান করা হয়েছে।

কৃষকদের আর্থিক চাপ কমাতে সরকার শস্য, ফসল, মৎস্য ও পশুপালন খাতে গৃহীত ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশে ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৫০০ জন কৃষক সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতেও উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় মানসম্মত ফিড উৎপাদন, পর্যাপ্ত পশু চিকিৎসা, সেবা, উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবন এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্প্রসারণে গুরুত্ব দেওয়া হবে। উপকূলীয় খাল, হাওর ও জলমহাল স্থানীয় জেলেদের জন্য উন্মুক্ত করার পাশাপাশি নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও জোরদার করা হবে।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হলো নারীর ক্ষমতায়ন। এই বিশ্বাস থেকে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীশিক্ষার প্রসারে মেয়েদের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ এবং একাডেমিক ও কারিগরি শিক্ষায় সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত রাজনীতি, প্রশাসন ও নীতিনির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নারী কর্মীদের জন্য নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এর অংশ হিসেবে সম্পূর্ণ নারী চালক দ্বারা পরিচালিত ও নারীর ব্যবস্থাপনায় বিশেষ 'পিঙ্ক বাস সার্ভিস' চালু করা হবে। পিঙ্ক বাস চালু হলে নারী কর্মজীবী ও শ্রমিকদের যাতায়াত ব্যবস্থা আরও নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক হবে।

'করব কাজ, গড়ব দেশ'– নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতভিত্তিক কর্মসংস্থানকে সরকার অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একটি বৈষম্যহীন কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' বা কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্র ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চালু হলে এর মাধ্যমে তৃণমূলের যোগ্য তরুণ-তরুণী ও শ্রমিকদের জন্য কাজের সুযোগ আরও সহজ হবে।

এছাড়া, সরকার দেশের তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, বেদে সম্প্রদায়সহ অবহেলিত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভাসমান ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ও সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৭ই জুন ২০২৬ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে ভিক্টোরিয়া স্কুল মাঠে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে উপকারভোগীদের মাঝে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করেন– পিআইডি

হতদরিদ্র এতিম শিশু ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে হতদরিদ্র এতিম শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভরণপোষণ তহবিল গঠন করার পাশাপাশি তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। একই সঙ্গে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে এসে তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সরকার বিভিন্ন ভাতার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ৬১ লাখ ব্যক্তি মাসে ৬৫০ টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে ভাতার পরিমাণ ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৭০০ টাকা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লাখ বাড়িয়ে ৬২ লাখ করা হবে।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারী ভাতা কর্মসূচিতে ভাতার পরিমাণ ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৭০০ টাকা করা হবে। এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লাখ বাড়িয়ে ৩০ লাখে উন্নীত করা হবে।

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা ৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৪ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৩৮ লাখে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির আওতা ৮১ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লাখে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মাসিক বৃত্তির পরিমাণ (বর্তমান মাসিক বৃত্তি ৯০০-১ হাজার ৩০০ টাকা) বাড়িয়ে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৪০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচিতে ভাতার হার ৮৫০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হলেও উপকারভোগী ১ লাখ ২৪ হাজার ২০০ জন বাড়িয়ে ১৮ লাখ ৯৫ হাজার ২০০ জন করা হচ্ছে।

ক্যানসার, কিডনি রোগ, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে পক্ষাঘাত, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সরকারের আর্থিক সহায়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমানে এসব রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হলেও ২০২৬-২০২৭ অর্থবছর থেকে সহায়তার পরিমাণ দ্বিগুণ করে ১ লাখ টাকা করা হবে। একই সঙ্গে উপকারভোগীর সংখ্যাও ৬০ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ৬৫ হাজারে উন্নীত করা হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা হবে। প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য তথ্যভিত্তিক ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরি করা হবে এবং দ্বৈত সুবিধা গ্রহণের সুযোগ বন্ধ করা হবে। নগদ সহায়তা সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক বা মোবাইল অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করতে বর্তমান সরকার একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মূল লক্ষ্য দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের জন্য একটি কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এসব উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করবে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন, স্বচ্ছতা এবং প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তবায়নের ওপর। উল্লিখিত কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস পাবে, আর সামাজিক নিরাপত্তা হয়ে উঠবে একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গঠনের শক্তিশালী ভিত্তি।

মো. মামুন অর রশিদ: উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

আমাদের পরিযায়ী পাখি

আশিকুর রহমান সমী

২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাস, জীবনে প্রথম দলবেঁধে পাখি দেখতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল কেরানীগঞ্জের আড়াকুলে। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। বেশি একটা কিছু তখন চিনতাম না, কিন্তু যা দেখতাম চিন্তার বাইরে। ঘাসবন, জলাভূমি, গ্রামীণ পরিবেশ সবকিছু মিলে অসাধারণ এক প্রতিবেশ ব্যবস্থা। আসত অসংখ্য পরিযায়ী পাখি। কিন্তু আজ দশ বছর পর, দখল-দূষণের আর মানুষের নগরায়ণের থাবায় নেই সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ। চিত্রটা শুধু ঢাকার না, সারাদেশের জলাভূমি, প্লাবনভূমি বা ঘাসবনসহ পরিযায়ী পাখিদের আবাসস্থলের। আর পাখিরাও সারাদেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে নীরবেই। আর গেল দশ বছরে এটা ছিল চোখে পড়ার মতো।

এই সবুজে মোড়া সজীব ধরিত্রীর বুকে নদীমাতৃক সৌন্দর্য, অপরূপ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরা এক অনন্য ভূখণ্ড বাংলাদেশ। ঋতুর পালাবদল, বিস্তীর্ণ জলাভূমি, পাহাড়, বনভূমি ও নদনদীর মায়াবী মিলনে গড়ে ওঠা এই দেশ যেন প্রকৃতির এক জীবন্ত শিল্পকর্ম। আর এই সৌন্দর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলংকার এ দেশের রংবাহারি পাখিকুল, যাদের সুরেলা কলকাকলি ও ডানার বর্ণিল ঔজ্জ্বল্যে বাংলাদেশের প্রকৃতি পায় এক অনন্য প্রাণচাঞ্চল্য ও মোহনীয়তা।

পাশাপাশি আবাসস্থলভিত্তিক বাংলাদেশ ২২টি জীব-পরিবেশগত অঞ্চলে বিভক্ত, যা বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য সৃষ্টি করেছে অনন্য এক প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল। এই জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে রয়েছে বাংলাদেশের অসংখ্য রঙিন ও সুরেলা পাখি। বর্তমানে দেশে ৭০০-এরও অধিক প্রজাতির পাখির বসবাস রয়েছে। তাদের সুমধুর কলকাকলি, মনোমুগ্ধকর রং ও বিচিত্র আচরণ বাংলাদেশের প্রকৃতিকে করেছে আরও মোহনীয় ও প্রাণবন্ত।

এই পাখিদের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিযায়ী পাখিরা। তারা যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক, তেমনি পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলাভূমি সংরক্ষণ, খাদ্যশৃঙ্খল বজায় রাখা, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের সূচক হিসেবে পরিযায়ী পাখিদের গুরুত্ব অপরিসীম। একই সঙ্গে বাংলাদেশের পর্যটন, গবেষণা এবং পরিবেশভিত্তিক অর্থনীতিতেও তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে সারাবছর মিলিয়ে প্রায় ২১০ প্রজাতির শীতকালীন পরিযায়ী পাখি, ১২ প্রজাতির গ্রীষ্মকালীন পরিযায়ী পাখি এবং ১৪ প্রজাতির পান্থ পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে। প্রতিবছর হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসব পাখি এ দেশের নদী, হাওর, বিল, চরাঞ্চল, উপকূল ও বনাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। তাদের আগমন শুধু প্রকৃতিকে নয়, বাংলাদেশের

জীববৈচিত্র্যকেও করে তোলে আরও সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শীতকালীন পরিযায়ী পাখিদের বড়ো একটি অংশ জলচর পরিযায়ী পাখি। ৩০ প্রজাতির বুনোহাঁস, চার প্রজাতির ডুবুরি, এক প্রজাতির ট্রপিক বার্ড, এক প্রজাতির প্যারাপাখি, ১২ প্রজাতির কোড়া, কালেম, ঝিল্লী, তিন প্রজাতির সারস, এক প্রজাতির শিয়ারওয়াটার, আট প্রজাতির মানিকজোড়-মদনটাক-স্টর্ক, এক প্রজাতির চামচঠুটি, তিন প্রজাতির ইবিস, ১৮ প্রজাতির বগা-বগলা, ২ প্রজাতির পেলিকেন, এক প্রজাতির ফ্রাইগেট বার্ড, এক প্রজাতির বুবি, তিন প্রজাতির পানকৌড়ি, এক প্রজাতির সাপপাখি, ৮৫ প্রজাতির সৈকতপাখি, ১২ প্রজাতির শিকারি পাখি, ১২ প্রজাতির মাছরাঙা, ছয় প্রজাতির খঞ্জন সাধারণত জলাশয়কেন্দ্রিক জীবনধারণ করে। একসময় সারাদেশের জলাশয়গুলো ছিল এই পাখি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। গ্রামীণ, বিল, বাঁওড়, প্লাবনভূমি, ঝিল, হাওরগুলো হারিয়েছে তাদের চিরচেনা রূপ। জলাভূমি ও পরিযায়ী পাখির ভবিষ্যৎ আজ এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। গত এক দশকে আমার পাখি পর্যবেক্ষণের একটি বড়ো অংশ ছিল জলাশয়কেন্দ্রিক। এই দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে, তা হলো বাংলাদেশের জলাশয়গুলো অসংখ্য জলচর ও পরিযায়ী পাখির জীবন, আশ্রয় এবং অস্তিত্বের ভিত্তি। অথচ সময়ের সাথে সাথে এই জলজ পরিবেশ দ্রুত হারিয়ে ফেলছে তার প্রাণ, আর তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে দেশের জলাভূমিকেন্দ্রিক পাখি বৈচিত্র্যের ওপর।

নদীবিধৌত বাংলাদেশ প্রকৃতিগতভাবেই এক বিশাল জলাভূমির দেশ। নদনদী, খালবিল, হাওর-বাঁওড়, ঝিল, ডোবা, নালা থেকে শুরু করে বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চল– দেশের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকাজুড়ে রয়েছে স্বাদু পানির জলাশয়, যা বর্ষাকালে প্রায় দেশের অর্ধেক ভূখণ্ডে বিস্তৃত হয়। এই জলাভূমিগুলো যুগ যুগ ধরে অসংখ্য পাখির জন্য নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে এসেছে। বিশেষ করে শীত মৌসুমে মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া ও হিমালয় অঞ্চলের হাজারো পরিযায়ী পাখি বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু বিগত দশ বছরে এই চিত্র ভয়াবহভাবে বদলে গেছে। ক্রমবর্ধমান মৎস্যচাষ, জলাশয় ভরাট, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, কৃষিজমিতে অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্পদূষণ এবং জলাভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের ফলে জলাশয়ের গুণগত মান দ্রুত অবনতি হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে পানির স্বাভাবিক জৈবক্রিয়া, ভেঙে পড়ছে খাদ্যশৃঙ্খল। ফলে জলচর পাখিরা হারাচ্ছে তাদের খাদ্যের উৎস, নিরাপদ আশ্রয় ও প্রজনন ক্ষেত্র। একসময় যে জলাশয়গুলো হাজারো পাখির কোলাহলে মুখর থাকত, সেগুলো আজ ক্রমেই পাখিশূন্য হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার নদীগুলোর চরাঞ্চল একসময় ছিল শীতকালীন পরিযায়ী জলচর পাখির অন্যতম প্রধান আশ্রয়স্থল। পদ্মা ও যমুনার বিস্তীর্ণ চরগুলো শীতে পরিণত হতো বুনোহাঁস, সৈকতপাখি, গাঙচিল, পানচিল ও বিভিন্ন শিকারি পাখির অভয়ারণ্যে। ২০১৮ সাল থেকে নিয়মিতভাবে পদ্মা ও যমুনার চরাঞ্চলে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। ২০২৩ সালে পুরো পদ্মা এবং ২০২৪ সালে যমুনার বিস্তৃত অংশজুড়ে পাখি বৈচিত্র্য স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের কোলাহলমুক্ত চরগুলো এখনও তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ, তবে সামগ্রিকভাবে পাখির সংখ্যা আগের তুলনায় দৃশ্যমানভাবে কমেছে। তবে এখানেও ক্রমাগত বেড়েছে মানুষের বিচরণ, কমেছে পাখিদের সংখ্যা।

বাংলাদেশের আইইউসিএন লাল তালিকাভুক্ত ৩৮ প্রজাতির ঝুঁকিগ্রস্ত পাখির মধ্যে প্রায় ২২ প্রজাতি নদীকেন্দ্রিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। এটি প্রমাণ করে নদী ও চরাঞ্চল পাখি বৈচিত্র্যের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে নদীপথে ইঞ্জিনচালিত নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি, চরাঞ্চলে অবাধ মানব চলাচল এবং ভয়াবহ পাখি শিকার এই পরিবেশকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে সবচেয়ে উদ্বেগজনক যে বিষয়টি চোখে পড়েছে, তা হলো পাখি শিকার এখন শুধু খাদ্যের প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ নেই, অনেক ক্ষেত্রে এটি উচ্চবিত্ত মানুষের বিনোদন ও শখের অংশে পরিণত হয়েছে।

পদ্মা অববাহিকাকেন্দ্রিক বৃহত্তর ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া ও আশপাশের অঞ্চলগুলো বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ জলাভূমিনির্ভর প্রতিবেশ ব্যবস্থা। বিল, বাঁওড়, প্লাবন ভূমি, চর ও ঘাসবন মিলে এখানে গড়ে উঠেছে অসাধারণ পাখির আবাসস্থল। গত সাত বছরের গবেষণায় এই অঞ্চলে ২৬০টিরও বেশি প্রজাতির পাখির উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যার মধ্যে প্রায় ১১২ প্রজাতিই পরিযায়ী। অথচ এই বিশাল জীববৈচিত্র্যের জন্য নেই কোনো কার্যকর সংরক্ষিত অঞ্চল।

বিশেষ করে বিল ও বাঁওড় বাংলাদেশের পরিযায়ী জলচর পাখিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় ৬ শতাংশ এলাকাজুড়ে রয়েছে Oxbow Lake বা বাঁওড়, যা জীববৈচিত্র্যের জন্য বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের গঙ্গা নিম্নবর্তী অঞ্চলে রয়েছে অন্তত ৮৭টি বাঁওড় এবং অসংখ্য বিল। দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় দেখা গেছে, এসব বাঁওড়ে প্রায় ২০০ প্রজাতির পাখি টিকে আছে, যার মধ্যে প্রায় ৭০ প্রজাতি পরিযায়ী।

শীতকালে পানি কমে গেলে বিল ও বাঁওড়ের জলজ উদ্ভিদের নিচে তৈরি হয় খাদ্যের বিশাল ভাণ্ডার। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সরালি, বালিহাঁস, তিলিহাঁস, মৌলভী হাঁস, ভূতি হাঁসসহ নানা প্রজাতির বুনোহাঁস। ডুবুরি, পানকৌড়ি, সাপপাখি, ডাহুক, কাস্তেচরা, শামুকখোল, জলময়ূর, খঞ্জন ও অসংখ্য সৈকতপাখির বিচরণে মুখর থাকে পুরো জলাভূমি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই

বিল-বাঁওড়গুলো আজ শিকার, দখল, দূষণ ও অপরিকল্পিত পর্যটনের কারণে হুমকির মুখে।

বাংলাদেশের আন্তঃদেশীয় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোও পাখি বৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিলেট ও চট্টগ্রামে সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকলেও যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বিল ও নদীকেন্দ্রিক পরিবেশ এখনো অনেকটাই অসংরক্ষিত। অথচ এখানেই দেখা মেলে সাদা গলা মানিকজোড়, কালো গলা মানিকজোড়, মদনটাক, বাংলা শকুন, ছোটো ধলাকপাল রাজহাঁস, বড়ো গুটি ঈগলসহ বহু ঝুঁকিগ্রস্ত পাখির। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের পরিবর্তন এবং মানবীয় চাপের কারণে এসব অঞ্চলেও পাখির সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে।

নগরায়ণও বাংলাদেশের জলচর পাখির জন্য বড়ো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একসময় জলাশয়ে পরিপূর্ণ ঢাকা শহর ছিল অসংখ্য জলচর পাখির আবাসস্থল। বর্তমানে অধিকাংশ জলাভূমি ভরাট হয়ে কংক্রিটের নগরে পরিণত হয়েছে। ফলে জলচর পাখিরা হারিয়েছে তাদের আবাসস্থল। তবুও বিস্ময়করভাবে এখনও ঢাকা শহরে প্রায় ১৬২ প্রজাতির পাখি টিকে আছে, যার মধ্যে প্রায় ৪০-৫০ প্রজাতি পরিযায়ী। কিন্তু প্রতিবছরই তাদের সংখ্যা কমছে। একই চিত্র ধীরে ধীরে দেশের অন্যান্য শহরেও দেখা যাচ্ছে।

আজ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক জলাভূমিগুলো ভয়াবহ সংকটের মুখে। উন্নয়ন ও পর্যটনের নামে প্রকৃতির মাঝে কৃত্রিম স্থাপনা নির্মাণ করে ধ্বংস করা হচ্ছে জলচর পাখির আবাসস্থল। অথচ একটি জলজ পরিবেশ ধ্বংস হলে সেখানে পরে যত গাছই লাগানো হোক না কেন, সেই হারিয়ে যাওয়া জলচর পাখিরা আর ফিরে আসে না।

জলচর ও পরিযায়ী পাখিদের রক্ষার প্রথম শর্ত হলো তাদের আবাসস্থল রক্ষা করা। জলাভূমির প্রাকৃতিক গুণগত মান বজায় রাখা ছাড়া পাখি সংরক্ষণ কখনো সম্ভব নয়। প্রয়োজন কার্যকর আইন প্রয়োগ, অবৈধ পাখি শিকার বন্ধ, পরিবেশবান্ধব নগর পরিকল্পনা এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি। কারণ পাখি পরিবেশের সৌন্দর্যের পাশাপাশি আমাদের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাই এখনই সময় বাংলাদেশের জলাভূমি ও পরিযায়ী পাখি রক্ষায় সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ গ্রহণের। অন্যথায় আগামী প্রজন্ম হয়ত বইয়ের পাতায় দেখবে সেইসব পাখিদের, যারা একসময় বাংলাদেশের নদী, বিল, বাঁওড় আর চরাঞ্চলকে প্রাণবন্ত করে রাখত।

আশিকুর রহমান সমী: প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী এক বছরকে 'নজরুল বর্ষ' ঘোষণা

আগামী এক বছরকে (২৫শে মে ২০২৬ থেকে ২৫শে মে ২০২৭ সাল পর্যন্ত) 'নজরুল বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ২৩শে মে ২০২৬ ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে এ ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী।

একটি নিরাপদ মানবিক রাষ্ট্র এবং সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনে পুনরায় বাংলাদেশের আবহমানকালের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পুনর্জীবন ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রেও কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন এবং কর্ম আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক।'

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, 'কবি নজরুলের জীবন এবং কর্ম বিশ্বসাহিত্য দরবারে আরও বেশি ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর জীবনবোধ, দর্শন প্রজন্মের পর প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হবে। এরই অংশ হিসেবে আমাদের জাতীয় কবির স্মৃতিবিজড়িত ত্রিশালকে নজরুল সিটি হিসেবে ঘোষণা করা যায় কি না, এ ব্যাপারে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং পর্যটন বিভাগের প্রতি আহ্বান জানাই।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ও কাজী নজরুল ইসলাম এক অবিভাজ্য সত্তা। তিনি আমাদের জাতীয় সত্তার সার্থক প্রতিনিধি। আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক, আমাদের জাতীয়তাবাদের প্রতীক।'

নজরুল জয়ন্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, স্বাগত বক্তব্য দেন ত্রিশালের সংসদ সদস্য মাহবুবুর রহমান ও স্মারক বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তারিক মনজুর। অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কবিপৌত্রী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান খিলখিল কাজী, ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক মো. লতিফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা, বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম, জেলা প্রশাসক মো. সাইফুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, বিভিন্ন সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কবি নজরুল গবেষণা ও কবির জীবন-দর্শন নিয়ে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দুইজন গুণীর হাতে নজরুল পদক ও সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পরে নজরুল স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচনও করেন তিনি। পরে প্রধানমন্ত্রী অতিথি সারিতে বসে নজরুল ইসলামের স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

প্রতিবেদন: কামরুল ইসলাম

হামঃ সচেতনতা, প্রতিরোধ ও আমাদের করণীয়

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

গ্রামের ছোট্ট ছেলে রাফি। বয়স মাত্র পাঁচ বছর। সারাদিন দৌড়াদৌড়ি আর খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকত সে। একদিন হঠাৎ তার জ্বর এলো। প্রথমে পরিবার ভেবেছিল সাধারণ সর্দি-জ্বর। কিন্তু দুই দিনের মধ্যেই তার চোখ লাল হয়ে গেল, কাশি বেড়ে গেল এবং শরীরজুড়ে লাল ফুসকুড়ি দেখা দিলো। গ্রামের কিছু মানুষ বলল, এটা হাম। ভয় নেই, ওষুধ খাওয়ালে নাকি উল্টো ক্ষতি হবে। কেউ আবার পরামর্শ দিলো শিশুকে অন্ধকার ঘরে রাখতে। ফলে প্রথমদিকে রাফিকে চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়নি। কয়েকদিন পর অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। চিকিৎসক জানালেন, সময়মতো চিকিৎসা ও টিকা না নেওয়ার কারণেই পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। রাফির গল্পটি কেবল একটি পরিবারের নয়; আমাদের সমাজে এখনও অসচেতনতা, কুসংস্কার এবং টিকা সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে অনেক শিশুই হামের ঝুঁকিতে রয়েছে।

হাম একটি অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাসজনিত (মিজেলস ভাইরাস) রোগ, যা মূলত শিশুদের বেশি আক্রান্ত করলেও যে-কোনো বয়সের মানুষ এতে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ভাইরাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং খুব দ্রুত অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটায়। হামের প্রধান লক্ষণ হলো উচ্চ জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং কয়েকদিন পর শরীরে লালচে ফুসকুড়ি দেখা দেওয়া। অনেকেই মনে করেন হাম একটি সাধারণ রোগ, যা কয়েকদিন পর নিজে থেকেই সেরে যায়। এটি আংশিক সত্য হলেও বাস্তবে এটি মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। এ সকল জটিলতার মূল কারণ, হাম শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, চোখের ক্ষতি এমনকি মস্তিষ্কের প্রদাহ পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ করে অপুষ্টিতে ভোগা শিশু এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এমনিতেই কম, তাদের জন্য হাম প্রাণঘাতীও হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এখনও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবছর বহু শিশু হামের কারণে মারা যায়, যদিও এটি সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগ।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবারও হামের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও সময় সময় বিভিন্ন এলাকায় হামের ছোটো-বড়ো প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ হলো টিকাদানের হার কমে যাওয়া এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব। কিছু মানুষ এখনও মনে করেন টিকার প্রয়োজন নেই বা টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি ক্ষতিকর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও অনেক সময় ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়ে, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ফলে কিছু পরিবার শিশুদের টিকা দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কিন্তু একজন আক্রান্ত ব্যক্তি খুব সহজেই আশপাশের বহু মানুষকে সংক্রমিত করতে পারে। তাই একটি পরিবারের অসচেতনতা পুরো সমাজের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হামের বিস্তার রোধ করতে হলে অধিকাংশ শিশুকে টিকার আওতায় আনতে হবে। দেশে হাম পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর ২০শে মে পর্যন্ত দেশে হাম ও উপসর্গে মৃতের সংখ্যা ছিল ৪৮৮। এর মধ্যে নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে ৮৩ শিশুর এবং উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে আরো ৪০৫ জন। একই সময়ে হাম ও উপসর্গে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে সুদানে। সেখানে মারা গেছে ৩৭১ জন। অথচ মার্চ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যায় বাংলাদেশের চেয়ে দুই ধাপ এগিয়ে ছিল সুদান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালে ভারত, পাকিস্তান, ইয়েমেন, মেক্সিকো, অ্যাঙ্গোলা, কাজাখস্তান, ইন্দোনেশিয়া, সুদান ও ক্যামেরুনসহ বহু দেশে নতুন করে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার মতো উন্নত দেশগুলোতেও হাম ফিরে আসার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মৃত্যুর সংখ্যার আধিক্যের কারণে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশকে ঘিরে। চলতি মাসে সংস্থাটি ‘মিজেলস অ্যান্ড রুবেলা গ্লোবাল সিচুয়েশন আপডেট’ নামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে হাম রোগীর সংখ্যা প্রকাশ করা

হয়েছে। এতে দেখা যায়, আক্রান্তের সংখ্যায় শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার নিচে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে, দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৫৮টিতেই সংক্রমণ ছড়িয়েছে। বিশেষ করে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে আক্রান্তের হার সবচেয়ে বেশি। আক্রান্তের তুলনায় বাংলাদেশে মৃত্যুহার বেশি হওয়ার পেছনে একাধিক কারণ কাজ করছে বলে মনে করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। দেশে হামে এ মৃত্যুহার এখন শূন্য দশমিক ৯৮ শতাংশ। মৃত্যুহার বেশি হওয়ার কারণের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত টিকাদানে ঘাটতি, দীর্ঘদিন এমআর (হাম-রুবেলা) ক্যাম্পেইন বন্ধ থাকা, শিশুদের অপুষ্টি, জটিল রোগী দেরিতে হাসপাতালে আসা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগ। সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও জটিলতা ও মৃত্যুহার বেশি হওয়ায় বাংলাদেশ এখন হাম সংক্রমণে বৈশ্বিক উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

হাম প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর এবং নিরাপদ উপায় হলো টিকাদান। বাংলাদেশ সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (EPI) মাধ্যমে শিশুদের বিনামূল্যে হাম ও রুবেলা টিকা দেওয়া হয়। নির্ধারিত বয়সে এই টিকা গ্রহণ করলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় এবং হাম হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। শুধু নিজের শিশুর সুরক্ষার জন্য নয়, পুরো সমাজকে নিরাপদ রাখার জন্যও টিকাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Herd Immunity)। কারণ, সমাজের অধিকাংশ মানুষ টিকা নিলে ভাইরাস সহজে ছড়াতে পারে না। তাই প্রতিটি অভিভাবকের দায়িত্ব হলো শিশুর টিকার সময়সূচি মেনে চলা এবং টিকার কার্ড সংরক্ষণ করা। কোনো কারণে টিকা বাদ পড়লে দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করা উচিত।

হাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা আজ সময়ের দাবি। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে এ বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। শিশুর জ্বর ও ফুসকুড়ি দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। আক্রান্ত শিশুকে কিছুদিন আলাদা রাখা উচিত, যাতে অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ না ছড়ায়। একইসঙ্গে পুষ্টিকর খাবার, পর্যাপ্ত পানি এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের সমাজে এখনও হাম নিয়ে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন হাম হলে গোসল করানো যাবে না, ওষুধ খাওয়ানো যাবে না বা চিকিৎসকের কাছে নেওয়া উচিত নয়। এসব ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও বিপজ্জনক। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে সময়মতো চিকিৎসা ও সঠিক পরিচর্যা জটিলতা অনেক কমিয়ে আনে। তাই গুজব বা লোকমুখে শোনা কথার পরিবর্তে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসরণ করাই উচিত।

বাংলাদেশ সরকার হাম নির্মূলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির পাশাপাশি বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়, যাতে প্রত্যন্ত এলাকার শিশুরাও টিকার আওতায় আসে। স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সচেতন করছেন এবং বিভিন্ন স্কুল ও কমিউনিটিতে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। টেলিভিশন, রেডিও এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও টিকার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার করা হচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাও বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে, যাতে ভবিষ্যতে হামমুক্ত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। তবে শুধু সরকারের উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণও প্রয়োজন।

সবশেষে বলা যায়, হাম একটি ভয়ংকর কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য রোগ। সচেতনতা, সঠিক চিকিৎসা এবং শতভাগ টিকাদান নিশ্চিত করতে পারলে এই রোগ থেকে অসংখ্য শিশুর জীবন রক্ষা করা সম্ভব। আমাদের উচিত কুসংস্কার ও গুজব দূর করে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান গ্রহণ করা এবং অন্যদেরও সচেতন করা। মনে রাখতে হবে, একটি ছোট্ট টিকা একটি শিশুর জীবন বাঁচাতে পারে, আর একটি সচেতন পরিবার গড়ে তুলতে পারে সুস্থ ও নিরাপদ সমাজ।

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী: চিকিৎসক ও প্রাবন্ধিক, jafri.drmc.dmc@gmail.com

পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জেতায় টাইগারদের অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রথমবারের মতো দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জেতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম রনি এ কথা জানান। ২০শে মে ২০২৬ সিলেটে দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানকে ৭৮ রানে হারায় টাইগাররা। এর আগে মিরপুরে প্রথম টেস্টে ১০৪ রানে জিতেছিল বাংলাদেশ।

২-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতার পাশাপাশি পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। এই জয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারতকে পেছনে ফেলে পঞ্চম স্থানে উঠে এলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অর্জন ৫৮.৩৩ শতাংশ পয়েন্ট। ৪৮.১৫ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে অবস্থান করছে ভারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের এমন সাফল্য অব্যাহত থাকবে এবং এই অর্জন তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আরও অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, দলীয় ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ভবিষ্যতে বিশ্বমঞ্চে আরও এগিয়ে যাবে। তিনি খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস

তন্বী তাবাসসুম

বাংলাদেশে নারী ও কিশোরীদের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং স্বাধীন চলাফেরার অধিকার নিশ্চিত করার বিভিন্ন সংগ্রামে 'ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস' একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রতিবছর ১৩ই জুন দেশে এই দিবসটি পালিত হয়। সমাজে নারীর প্রতি অবমাননাকর আচরণ, যৌন হয়রানি এবং মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলাই এই দিবসের প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে নারী-পুরুষ সমানভাবে সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে নারীরা এখনো যে সামাজিক সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি গুরুতর সমস্যা হলো ইভটিজিং। ইভটিজিং শুধু একটি সামাজিক সমস্যা নয়; এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি গুরুতর রূপ। এর ফলে অসংখ্য নারী ও কিশোরী প্রতিদিন মানসিক কষ্ট, নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়।

'ইভটিজিং' শব্দটি মূলত নারীদের উদ্দেশ্যে করা অশালীন মন্তব্য, কটূক্তি, শিস দেওয়া, অশোভন অঙ্গভঙ্গি, অনুসরণ করা, স্পর্শ করার চেষ্টা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হয়রানি কিংবা অন্য যে-কোনো আচরণকে বোঝায়, যা একজন নারী বা কিশোরীর জন্য মানসিক অস্বস্তি ও অপমানের কারণ হয়। ইভটিজিংকে অনেকেই অনেক সময় 'মজা' বা 'হালকা মন্তব্য' হিসেবে প্রকৃত মূল্যায়ন না করলেও বাস্তবে এটি নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে আঘাত করে। কোনো মেয়ে বা নারী রাস্তায় একা চললে তাকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের মন্তব্য করা মানসিক হয়রানির শামিল।

ইভটিজিং রাস্তা, স্কুল-কলেজ, বাজার, যানবাহন, কর্মক্ষেত্র এমনকি অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও ঘটে থাকে। বর্তমানে প্রযুক্তির প্রসারের কারণে সাইবার ইভটিজিংও একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রাম বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারীদের উদ্দেশ্যে অশালীন বার্তা, ছবি বা মন্তব্য পাঠানো এখন খুবই সাধারণ ঘটনা।

ইভটিজিংয়ের কারণে কয়েকটি হৃদয়বিদারক ঘটনার পর বিষয়টি জাতীয়ভাবে আলোচনায় আসে। অনেক নারী ও কিশোরী হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক বা অভিভাবকরা বখাটেদের বাধা দিতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন। এসব ঘটনা দেখায় যে শুধু ভুক্তভোগী নয়, প্রতিবাদকারীরাও ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে দেশজুড়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং সরকার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। তবে বাংলাদেশে ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবসের সূচনা একটি মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমে। ২০১০ সালে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা সারাদেশে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ঘটনার পর সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৩ই জুন দিনটিকে ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই দিবস পালনের মাধ্যমে সমাজকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, নারীর প্রতি যে-কোনো ধরনের হয়রানি অগ্রহণযোগ্য এবং এর বিরুদ্ধে সবাইকে একযোগে জনসচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ইভটিজিংয়ের পেছনে নানা সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কারণ হলো নৈতিক শিক্ষার অভাব। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অনেক শিশু ও কিশোর যথাযথ নৈতিক শিক্ষা পায় না। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মূল্যবোধ গড়ে না উঠলে তারা সহজেই এই অসামাজিক আচরণটিতে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ইভটিজিংয়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ। আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে নারীদের দুর্বল ও অধীনস্থ হিসেবে দেখার প্রবণতা রয়েছে। এই মানসিকতা থেকেই অনেক পুরুষ নারীদের প্রতি অবমাননাকর আচরণকে স্বাভাবিক মনে করে। এই ভুল ধারণা থেকেই অনেক সময় নারীদের প্রতি অসম্মান, কটূক্তি ও হয়রানিমূলক আচরণ সৃষ্টি হয়, যা ইভটিজিংয়ে রূপ নেয়।

সামাজিক সচেতনতার অভাবে ইভটিজিং আরো প্রকট আকার ধারণ করে। সমাজের অনেক মানুষ এখনও ইভটিজিংকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে না। মেয়েরা ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই উল্টো ভুক্তভোগীকেই দোষারোপ করা হয়। ফলে অপরাধীরা সামাজিক শাস্তির ভয় পায় না। এছাড়াও আইনের প্রয়োগ শক্তিশালী হলে অপরাধ করার প্রবণতা কমে। যদিও দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনসহ বিভিন্ন আইন রয়েছে, কিন্তু অনেক সময় আইনের দুর্বল প্রয়োগ বা যথাযথ প্রয়োগের অভাবে অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। ফলে ইভটিজিং করলে তেমন কোনো শাস্তি হবে না– এই ধারণা থেকে অপরাধীরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

ইভটিজিংয়ের আরেকটি অন্যতম প্রধান কারণ হলো নেতিবাচক বন্ধুমহল। অনেক সময় কিছু তরুণ বন্ধুবান্ধবের প্ররোচনা, অশালীন মজা বা ভুল মানসিকতার কারণে ইভটিজিংয়ের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এই অসভ্য আচরণকে স্বাভাবিক মনে করতে শুরু করে। তারা এটিকে সাহসিকতা বা আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। কিছু ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীদের প্রতি অসম্মানজনক উপস্থাপন, অশালীন বিষয়বস্তুর প্রচার এবং হয়রানিমূলক আচরণকে স্বাভাবিক বা বিনোদনের অংশ হিসেবে দেখানো ইভটিজিংকে উৎসাহিত করে।

'চুমকি চলেছে একা পথে সঙ্গী হলে দোষ কি তাতে?'– এই বহুল

প্রচলিত গানের অংশটি আমাদের কাছে সুপরিচিত। বাস্তবিকভাবে এই গানটি অন্য উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এটি ইভটিজিংয়ের একটি সাধারণ উদাহরণ। কিছু চলচ্চিত্র, নাটক বা অনলাইন কনটেন্টে নারীদের উত্যক্ত করাকে রোমান্টিক বা হাস্যরসাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয় যা দর্শকদের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি করে।

এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কটূক্তি, ট্রলিং ও অনলাইন হয়রানিও ইভটিজিংয়ের একটি আধুনিক রূপ হিসেবে দেখা যায়। স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সহজলভ্যতার কারণে অনলাইনে ইভটিজিংয়ের প্রবণতা বেড়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি মানুষের জীবন সহজ করলেও কিছু ব্যক্তি তা ব্যবহার করছে নারী ও কিশোরীদের হয়রানি, ভয়ভীতি ও মানসিক নির্যাতনের জন্য। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অশালীন বার্তা, ছবি বা ভিডিও পাঠানো, অনুমতি ছাড়া ছবি বা ভিডিও ধারণ করে অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া, ভুয়া আইডি খুলে অপমানজনক পোস্ট করা, মোবাইল ফোনে বার বার কল বা মেসেজ দিয়ে বিরক্ত করা, ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা, এডিট করা ছবি বা ভিডিও ব্যবহার করে মানহানি করা এসবের মাধ্যমে নারী ও কিশোরীরা প্রতিনিয়ত সাইবার বুলিং বা ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে।

ইভটিজিং একজন নারীর জীবনে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। এর ফলে শুধু ব্যক্তি নয়, পরিবার ও সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি দেশ তখনই উন্নত হতে পারে যখন নারী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। কিন্তু ইভটিজিং নারীর ক্ষমতায়নের পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হয়রানি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক নারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে পূর্ণাঙ্গভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। বাইরে চলাফেরা ও নিজের মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ভয় কাজ করে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে নারীরা তাদের দক্ষতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এভাবে ইভটিজিং নারী উন্নয়ন, সমঅধিকার এবং সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে।

ইভটিজিং মেয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনেক মেয়ে স্কুল বা কলেজে যাওয়ার পথে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। ইভটিজিংয়ের ভয়ে অনেক ছাত্রী নিয়মিত স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে অনীহা বোধ করে। ফলে তাদের উপস্থিতি কমে যায় এবং পড়াশোনায় মনোযোগ নষ্ট হয়। অনেক পরিবারও নিরাপত্তার উদ্বেগে নারীদের সুযোগ-সুবিধা সীমিত করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকেরা মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ করে দেন বা অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং তাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে।

ইভটিজিং ভুক্তভোগী নারী বা কিশোরীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফলে ভুক্তভোগী ভয়, উদ্বেগ, লজ্জা ও অপমানবোধে ভুগতে থাকে। অনেক নারী বা কিশোরী বার বার হয়রানির শিকার হওয়ার কারণে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তা কাজ করে। তারা বাইরে বের হওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা বা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে ভয় পায়। ফলে তাদের সামাজিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে, একাকীত্ব বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। অনেকের মধ্যে বিষণ্নতা, মানসিক চাপ ও একাকীত্বের অনুভূতি তৈরি হয়।

ইভটিজিংয়ের শিকার ব্যক্তিরা প্রায়ই সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘমেয়াদে এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। চরম মানসিক নির্যাতনের ফলে কিছু নারী আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নেয়।

ইভটিজিং প্রতিরোধে এর বিরুদ্ধে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, গণমাধ্যম এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের সক্রিয় ও সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা মানুষকে মানবিক ও সহনশীল হতে শেখায়। পরিবার হলো জীবনের প্রথম পাঠশালা। পরিবারের শিশুদের ছোটোবেলা থেকেই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। পরিবারে নারীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ শিশুরা পরিবার থেকেই প্রথম শিক্ষাগ্রহণ করে। ছেলে সন্তানকে শেখাতে হবে নারীর প্রতি সম্মান দেখাতে এবং নারীর প্রতি সহিংস আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইভটিজিং প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ইভটিজিংবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত সেমিনার, আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কাউন্সেলিং ব্যবস্থা চালু করা জরুরি। কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে বিপথগামী শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে ফেরত আনার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে কঠোর নীতিমালা থাকতে হবে। অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি (যেমন: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার বা ছাত্রত্ব বাতিল) প্রয়োগ করতে হবে।

তরুণরাই একটি দেশের ভবিষ্যৎ। তাই ইভটিজিং প্রতিরোধে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। বন্ধুমহলে কেউ নারীদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য করলে তার প্রতিবাদ করতে হবে। তরুণদের বুঝতে হবে যে নারীর প্রতি সম্মান দেখানোই প্রকৃত সভ্যতার পরিচয়। এছাড়াও ইভটিজিং প্রতিরোধে নারীদেরও আত্মরক্ষার কৌশল জানা গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা প্রয়োজনে আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে দ্রুত সাহায্য চাইতে হবে এবং প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইভটিজিং প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি, জনমত গঠন এবং অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে ইভটিজিংয়ের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে এবং ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। গণমাধ্যমকে ইতিবাচক ও শিক্ষামূলক প্রচারণা চালাতে হবে। একইসাথে নাটক, চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপনে নারীদের সম্মানজনকভাবে উপস্থাপন করা জরুরি।

গণমাধ্যমের সাহায্যে ইভটিজিংকে সামাজিক অপরাধ হিসেবে তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে হবে। ইভটিজিং-সংক্রান্ত আইন ও শাস্তি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করলে সম্ভাব্য অপরাধীরা অপরাধ করতে নিরুৎসাহিত হবে এবং ভুক্তভোগীরা আইনগত সহায়তা গ্রহণে উৎসাহিত হবে।

এছাড়াও গণমাধ্যমে ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তাদের পাশে দাঁড়ানো যেতে পারে এবং ইভটিজিংয়ের ঘটনা ও এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

তবে ইভটিজিং প্রতিরোধে সরকারের কার্যকর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং অপরাধীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। আইন যথাযথভাবে কার্যকর হলে অপরাধের প্রবণতা কমে যাবে। দঃখজনক হলেও বাংলাদেশে ইভটিজিং প্রতিরোধে আলাদা বিশেষায়িত কোনো আইন নেই। বিভিন্ন আইন ও বিধির মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১. দণ্ডবিধি ১৮৬০ (Penal Code ১৮৬০)

- ধারা ৩৫৪: কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে আক্রমণ বা বলপ্রয়োগ করলে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।
- ধারা ৫০৯: কোনো নারীকে উদ্দেশ্য করে অশালীন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা আচরণের মাধ্যমে তার মর্যাদাহানি করলে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০

- ধারা ১০: যৌন নিপীড়ন বা অশোভন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নারী বা শিশুকে হয়রানি করলে দুই বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। গুরুতর ক্ষেত্রে শাস্তির মেয়াদ দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

৩. ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬

- ধারা ৭৬: জনসমক্ষে নারীদের উত্ত্যক্ত করা, অশালীন ভাষা ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গি করা বা চলাচলে বাধা সৃষ্টি করলে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

৪. উচ্চ আদালতের নির্দেশনা

- বাংলাদেশের উচ্চ আদালত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছে। এসব নির্দেশনা ইভটিজিং প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ (Cyber Security Act 2023) অনুযায়ী অনলাইন ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ভুক্তভোগী বাংলাদেশ পুলিশের Cyber Crime Investigation Division বা সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে অভিযোগ করতে পারেন। এসব আইনের উদ্দেশ্য হলো নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানি ও মানসিক নির্যাতন থেকে সুরক্ষা প্রদান করা। ইভটিজিং প্রতিরোধে সরকারের উচিত এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি দ্রুত প্রণয়ন করা।

সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে সেমিনার, প্রচারাভিযান, কর্মশালা ও গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে ইভটিজিংয়ের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত করতে পারে। বাজার ও জনসমাগমস্থলে পুলিশি টহল জোরদার করার সাথে প্রতিটি থানায় অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা, পরামর্শদান কেন্দ্র এবং শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ভুক্তভোগীরা যাতে সহজে অভিযোগ জানাতে পারে, সে জন্য জাতীয় হটলাইন নম্বর ও অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থা চালু ও কার্যকর রাখতে হবে।

তবে ইভটিজিং প্রতিরোধ শুধু আইন দিয়ে সম্ভব নয়, এর জন্য সামাজিক আন্দোলন দরকার। সমাজের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। একটি সভ্য ও উন্নত সমাজে নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা নিয়ে বসবাস করবে এটাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য। শিক্ষক, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা, জনপ্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং সাধারণ মানুষ সবাইকে সচেতন হতে হবে। কাউকে হয়রানির শিকার হতে দেখলে চুপ না থেকে প্রতিবাদ করতে হবে। যখন সমাজ ইভটিজিংকে ঘৃণার চোখে দেখবে, তখন অপরাধীরা নিরুৎসাহিত হবে।

বিশ্বের অনেক দেশে International Anti-Street Harassment Week পালন করা হয়। এটি প্রথমে ২০১১ সালে International Anti-Street Harassment Day হিসেবে শুরু হয় এবং ২০১২ সাল থেকে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিতে পরিণত হয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ইভটিজিং প্রতিরোধে বিভিন্ন রাজ্যে নারী নিরাপত্তা সপ্তাহ, সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং বিদ্যালয় ও কলেজভিত্তিক কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

আমাদের দেশে ১৩ই জুন ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠন আলোচনাসভা, র‍্যালি, মানববন্ধন, সেমিনার ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার আহ্বান জানানো হয়। ১৩ই জুনের ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস আমাদের শুধু একটি দিন পালন করার আহ্বান জানায় না; এটি একটি মানবিক ও সচেতন সমাজ গঠনের বার্তা দেয়। ইভটিজিং নারীর মর্যাদা, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অপরাধ। এর বিরুদ্ধে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকার, গণমাধ্যম এবং সমাজের প্রতিটি মানুষকে একযোগে কাজ করতে হবে।

ইভটিজিং একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি যা আমাদের সমাজের সুস্থ বিকাশের পথে বড়ো বাধা। এই সমস্যা দূর করতে হলে শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, পারিবারিক শিক্ষা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সচেতনতা, নৈতিক শিক্ষা, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা ইভটিজিংমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি। নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মানে দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করা। ১৩ই জুন ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস আমাদেরকে এই বিষয়ে নতুন করে ভাবতে শেখায় এবং একটি নিরাপদ, সম্মানজনক সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। তাই আসুন, আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি নারীর প্রতি যে-কোনো ধরনের হয়রানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হব এবং একটি নিরাপদ, সুন্দর ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করব।

তন্বী তাবাসসুম: সহকারী পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তামাক ও নিকোটিন আসক্তি থেকে সুরক্ষা

সৈয়দা অনন্যা রহমান

প্রতিবছর ৩১শে মে সারাবিশ্বে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয় বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস (World No Tobacco Day)। দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য তামাকজনিত অকাল মৃত্যু ও রোগ প্রতিরোধ এবং তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা । বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য– 'Unmasking the appeal–countering nicotine and tobacco addiction.' এই প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে তামাক কোম্পানির মুখোশ উন্মোচন এবং নিকোটিন ও তামাক আসক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কীভাবে তামাক ও নিকোটিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বব্যাপী কঠোর তামাক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এড়িয়ে নতুন প্রজন্মকে, বিশেষ করে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের আসক্ত করার জন্য ক্রমাগত তাদের পণ্যকে নতুনভাবে উদ্ভাবন ও মোড়কজাত করছে সে বিষয়টি তুলে ধরার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে সারাবিশ্ব সোচ্চার হওয়ায় ধীরে ধীরে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। একদিকে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা ক্ষতিকর তামাক পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে; অন্যদিকে কোম্পানিগুলো নতুনদের আকৃষ্ট করতে ই-সিগারেট, নিকোটিন পাউচ, সিন্থেটিক নিকোটিন ডিভাইসের মতো নতুন ও উদীয়মান আসক্তি সৃষ্টিকারী পণ্যগুলোর আগ্রাসী বিপণন করছে; যা তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কষ্টার্জিত সাফল্যকে হুমকির মুখে ফেলছে।

সারা পৃথিবীতেই তামাক ও নিকোটিন উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদিত পণ্যের ক্ষতিকর দিক আড়াল করতে নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করছে। এসকল কৌশল ব্যবহার করে তরুণ জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিকর আসক্তি সৃষ্টিকারী নেশা পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করছে। ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণে অর্জিত অগ্রগতি নতুন করে ঝুঁকির মুখে পড়ছে। তামাক কোম্পানিগুলো সাধারণত যেসকল কৌশল ব্যবহার করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

- আকর্ষণীয় ডিজাইনের মোড়ক বা প্যাকেট তৈরি করে বাজারজাত করা।
- নানা ধরনের সুগন্ধী বা ফ্লেভারযুক্ত করা (বিশেষত তরুণদের আকৃষ্ট করতে) ।
- ই-সিগারেট ও নতুন নিকোটিন পণ্য 'কম ক্ষতিকর' উল্লেখ করে ব্যাপক প্রচারণা চালানো।
- সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আড়ালে নিজেদের পণ্যের ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি।

তামাক ও নিকোটিন উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর এসব কৌশল তরুণদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করে এবং ধীরে ধীরে আসক্তি তৈরি করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুসারে, সারাবিশ্বে ১৩-১৫ বছর বয়সি ৪ কোটি শিশু বর্তমানে অন্তত একটি তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে। এদের মধ্যে ২ কোটি শিশু সিগারেট এবং ১ কোটি শিশু ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করে। এছাড়াও ১৩-১৫ বছর বয়সি অন্তত দেড় কোটি

কিশোর-কিশোরী ইতোমধ্যেই ই-সিগারেট ব্যবহার করছে। যেসব দেশ থেকে এধরনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে, সেখানে প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের ভ্যাপিং গড়ে ৯ গুণ বেশি।

বাংলাদেশে সকল ধরনের তামাক পণ্যের সহজপ্রাপ্যতা এবং সহজলভ্যতা, কম দাম, আসক্তি সৃষ্টিকারী ই-সিগারেট ও নতুন নিকোটিন পণ্য নিয়ন্ত্রণে কোনো আইনগত বাধা না থাকা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনের দুর্বল প্রয়োগের কারণে তরুণদের মধ্যে এসকল পণ্য ব্যবহারের ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। খুচরা শলাকা বিক্রয়ের সুযোগ এবং অনিয়ন্ত্রিত বিপণন ব্যবস্থা এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। একই সঙ্গে তামাক ও নিকোটিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নীতি প্রণয়ন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে ২০০৫ সালে সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস করে। দীর্ঘ সময় পর ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় ই-সিগারেট ও নিকোটিন পণ্য নিয়ন্ত্রণে বিধান রেখে তামাক নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ পাস করা হয়। ২০২৬ সালে ত্রয়োদশ সংসদ অধিবেশনে অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করার জন্য বিল আকারে উত্থাপন করা হয়। তবে বিলটি পাসের ক্ষেত্রে ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টস (ই-সিগারেট, নিকোটিন পাউচ, হিটেড টোব্যাকো প্রডাক্ট) ইত্যাদি দ্রব্যকে সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়ার পাশাপাশি এসকল পণ্য নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিধানও বিলুপ্ত করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টের মতো নতুন নেশা দ্রব্য শিশু-কিশোরদের নিকট অবাধে বিক্রি করার সুযোগ তৈরি হওয়ায় এর মাধ্যমে নিকোটিনে আসক্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে। দেশের তরুণদের স্বাস্থ্য নতুন করে ঝুঁকির মুখে পড়বে। ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্ট (ই-সিগারেট, নিকোটিন পাউচ, হিটেড টোব্যাকো)-এর ব্যবহার বাংলাদেশে প্রায় ছিল না বললেই চলে। ২০১৭ সালে পরিচালিত গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে-এর তথ্যানুসারে বাংলাদেশে এটি ব্যবহারের হার ছিল মাত্র ০.০২ শতাংশ। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে এই হার অনেক বেড়েছে। বর্তমানে এসব পণ্য ব্যবহারকারীদের প্রায় ৯৫ শতাংশ তরুণ ও শিক্ষার্থী। সারাদেশে ই-সিগারেটের দোকানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'গ্লোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০২১' প্রতিবেদন অনুসারে, ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম (ENDS) আসক্তি তৈরি করে এবং এটি মোটেও নিরাপদ নয়। ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইরান, ইরাক, ওমান, কাতারসহ বিশ্বের মোট ৪৭টি দেশে ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম (ENDS)/ই-সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দেশে তামাকের কারণে বছরে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার মানুষ মারা যায়। তামাক শুধু স্বাস্থ্য নয়, অর্থনীতি ও পরিবেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তামাক থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব পাওয়া যায়, চিকিৎসা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি। দেশে তামাক ব্যবহারের কারণে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতার যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তার পরিমাণ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৮৭ হাজার কোটি টাকা। এ সময়কালে সরকার তামাকজাত পণ্য থেকে রাজস্ব পেয়েছে ৪১ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং এটি প্রমাণিত যে এখাতে আয়ের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি থেকে সুরক্ষায় প্রয়োজন Holistic Approach । তবে আশার কথা, সম্প্রতি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ সংশোধন) আইন ২০২৬ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। সংশোধিত আইনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। সংশোধিত আইনে উল্লিখিত যে বিষয়গুলো যুক্ত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

- পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে পাবলিক প্লেসের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেজিং-এর ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং যুক্ত হয়েছে।
- পাবলিক প্লেসে ও পরিবহণে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ ৩০০ টাকার পরিবর্তে ২০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে তামাকজাত দ্রব্য (জর্দা, গুল, সাদাপাতা) নিষিদ্ধ করা হয়েছে (উল্লেখ্য পূর্বে পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে শুধু ধূমপান করা নিষিদ্ধ ছিল)।
- কোনো পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের বিধান লঙ্ঘন করা হলে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে (পাঁচ হাজার টাকা)।
- ওয়েবসাইট এবং ওয়েব পেইজে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক মেইল এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে তামাকপণ্যের কোনো ধরনের প্যাকেট, কৌটা, খালি বা নমুনা মোড়ক প্রদর্শনসহ যে-কোনো ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলাধুলার স্থান ও শিশুপার্কের সীমানার ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- মোড়ক বা কৌটা ব্যতীত তামাক পণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আইনটি যেহেতু সদ্য সংশোধন করা হয়েছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে

জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত এটি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইনটি প্রণয়ন করা হলেও মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন এখনো দুর্বল। এক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নিয়মিত বিদ্যমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বেসরকারি সংস্থাগুলো নিয়মিত মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে এবং প্রশাসনের কাছে পৌছে দিচ্ছে। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট-এর উদ্যোগে ২০২৩-২০২৫ সালে দেশের ৩০টি জেলার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বাস্তবায়নের চিত্র তুলে আনা হয়। সেখানে দেখা যায়, ৫৫% (১৭টি) জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত হয় না। ৬০% (১৮টি) জেলায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৩ মাস পর পর সতর্ক বাণী পরিবর্তন করা হয় না। ৩০% (৯টি) জেলায় পাবলিক প্লেসে নো-স্মোকিং সাইনেজ পাওয়া যায়নি। ৩৫% (১১টি) জেলায় বিড়ি-জর্দা-গুলের কৌটায় আইন অনুসারে স্বাস্থ্য সতর্ক বাণী নেই। আইনে নিষিদ্ধ থাকার পরও ৮৫% (২৬টি) জেলায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নজরে এসেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোরও এ বিষয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। খাদ্য উৎপাদনযোগ্য জমিতে ক্ষতিকর তামাক চাষ বন্ধে কৃষি, ভূমি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা জরুরি। সেইসাথে তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্য সাধারণ জনগণের ক্রয় সক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হলে এসকল পণ্যের ওপর উচ্চ হারে করারোপ ও মূল্য বৃদ্ধি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুক্ত হওয়া জরুরি। ক্ষতিকর ই-সিগারেট ও নতুন নিকোটিন পণ্য নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা। নারী, শিশু ও তরুণদের তামাকের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি একেবারে কম নয়। এসকল অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, টাস্কফোর্স কমিটি গঠন, স্থানীয় সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন, গাইড লাইন প্রণয়ন, তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষায় স্বাস্থ্য, রেলপথ ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কোড অব কন্ডাক্ট গ্রহণ, তামাক পণ্যে ১% সারচার্জ আরোপসহ সরকারের অনেক প্রশংসনীয় উদ্যোগ রয়েছে।

শুধু আইন প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়, প্রয়োজন আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন। এ সকল ক্ষেত্রে শক্তিশালী নীতিমালা এবং তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে নিকোটিন ও তামাক আসক্তি প্রতিরোধ সম্ভব। তামাক নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা নীতিতে তামাক কোম্পানির প্রভাব। ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষায় আর্টিক্যাল ৫.৩-তে বিস্তারিত উল্লেখ করেছে। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের এফসিটিসি-এর আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষায় গাইড লাইন প্রণয়ন ও অ্যাডাপ্ট করা প্রয়োজন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে তামাক পণ্য ও নিকোটিন পণ্যের আকর্ষণ কমাতে এবং আসক্তি প্রতিরোধে দ্রুত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। যেমন- ই-সিগারেট, ভেপিং, নিকোটিন পাউচ নিষিদ্ধে পৃথক আইন প্রণয়ন করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য শিক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক পণ্য বিক্রয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, তামাক পণ্যের আকর্ষণীয় ডিজাইনের মোড়ক নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি এসকল পণ্যে নানা ধরনের ফ্লেভার ব্যবহার বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা, উচ্চ কর আরোপের মাধ্যমে পণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়ন করা, সহজলভ্যতা কমাতে সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রয় বন্ধের মতো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত নীতি প্রণয়ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার এবং FCTC-এর আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা, বেসরকারি সংস্থাগুলোকে যুক্ত করে নিয়মিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা করা, গণমাধ্যম ও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম জোরদার করা প্রভৃতি।

তামাকের কারণে অসুস্থতা এবং অকাল মৃত্যুর হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সড়ক দুর্ঘটনা, পানিতে ডুবে মৃত্যু, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি অস্বাভাবিক মৃত্যু একসঙ্গে যোগ করলেও তামাকের ফলে মৃত্যুর সমান নয়। তামাক ও নিকোটিন আসক্তি থেকে সুরক্ষায় প্রয়োজন আইন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও কৌশল নির্ধারণ। সুতরাং তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দিয়ে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সমন্বিত ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করার এখনই সময়।

সৈয়দা অন্যন্যা রহমান: হেড অব প্রোগ্রাম (টিসি & এনডিসি) ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ রাইটস, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ঢাকা, info@wbbtrust.org

'ফুলকবি' সুফিয়া কামাল

ইমরুল ইউসুফ

সুফিয়া কামালের বয়স তখন ছয় বছর। সবেমাত্র দাঁত পড়া শুরু হয়েছে। মা সাবেরা খাতুনের সঙ্গে বেড়াতে গেলেন কলকাতায়। সেখানে প্রথম দেখা হয় বেগম রোকেয়ার সঙ্গে। সাল ছিল ১৯১৭। সুফিয়া কামালের মা বেগম রোকেয়াকে ফুফুআম্মা বলে ডাকতেন। বেগম রোকেয়া চেয়েছিলেন সুফিয়া কামালকে তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠান 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'-এ ভর্তি করাতে। সাবেরা খাতুনকে বললেন, আমার স্কুল তো আমি করেছি। সেখানে অনেক মেয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলমান সবাই। কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনদের কোনো মেয়ে আমার স্কুলে পড়ে না। সুফিয়াকে পড়াবেন? সুফিয়া কামালের মা জবাব দিয়েছিলেন, আমরা তো কলকাতায় থাকি না। নয়ত তোমার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতাম।

সুফিয়া কামাল বেগম রোকেয়ার সঙ্গে প্রথম দেখার সেই স্মৃতি বর্ণনা করেছেন এভাবে– 'বেগম রোকেয়ার সঙ্গে আমার যখন দেখা হয় তখন ত আমি ছোট। প্রথম সাক্ষাতে বেগম রোকেয়া আমার সাথে কথা বললেন বাংলায়। আমাকে খুব আদর করলেন। বললেন, বুবু, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে? আমি তো সেসময় খুব কম কথা বলতাম। উনাকে আমার এত ভালো লাগল যে, আমি ওনার কোল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। আমাকে খুব আদর করলেন।'

দীর্ঘ প্রায় একযুগ পর ১৯২৮ সালে কলকাতায় বেগম রোকেয়ার সঙ্গে সুফিয়া কামালের পুনরায় দেখা হয়। সুফিয়া কামাল তখন কবি। পত্রপত্রিকায় লিখছেন সুফিয়া এন. হোসেন নামে। বিমানে চড়ে গেলেন কলকাতায়। তিনিই বাংলার প্রথম মুসলিম নারী যিনি বিমান ভ্রমণের বিরল সুযোগ পেয়েছিলেন। এজন্য বেগম রোকেয়া তাঁর স্কুলে আয়োজন করেছিলেন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। সুফিয়া কামালকে দেখে বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, 'ফুলকবি তুই তো লেখাপড়া শিখলি না। কিন্তু কবি তো হয়ে গেলি।' শুধু তাই নয়, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সুফিয়া কামালকে উদ্দেশ করে আরও বলেছিলেন, 'ফুলকবি তুই তো এখন আসমানে উঠতে শিখেছিস। তোকে তো একটি মালা দিতে হয়।' এই কথা বলে সুফিয়া কামালের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া।

সুফিয়া কামালকে 'ফুলকবি' বলে ডাকার পেছনে ছিল তাঁর কবিত্বের কোমলতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের স্বীকৃতি। কারণ হিসেবে বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, সুফিয়া কামালের কবিতাগুলো ছিল ফুলের মতো কোমল ও অনুভূতিপূর্ণ। ভাষা ছিল সহজ-সরল এবং গভীর আবেগে ভরা। এজন্যই বোধ হয় বেগম রোকেয়া সুফিয়া কামালকে 'ফুলকবি' বলে উৎসাহ দিতেন। যেন তিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যেতে পারেন। বেগম রোকেয়ার এমন স্নেহধন্য প্রেরণাই সুফিয়া কামালকে করেছিল অগ্রগামী। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। দেশকে যুগোপযোগী শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চায় রেখেছেন অগ্রণী ভূমিকা। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির 'অস্তিত্বের স্মারক', বাঙালির 'সাহসী ঠিকানা'।

ভিন্ন প্রজন্মের মানুষ হলেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সুফিয়া কামালের সম্পর্ক ছিল আত্মিক। সাহিত্যজীবনের শুরুতে রবীন্দ্রসাহিত্য সুফিয়া কামালকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের রচনার মাধ্যমে তিনি কেবল সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ হননি, বরং উদারতা ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে তৈরি হয় গভীর ভিত্তি। সুফিয়া কামাল তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন– 'কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহও কি কম পেলাম? তাঁর জন্মদিনে তাঁকে কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম। তিনিও সুন্দর করে কটি কবিতার লাইন লিখে আমাকে পাঠালেন। সাদর আমন্ত্রণ জানালেন কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতে। কতবার তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। তাঁর নিজের অভিনয় করা নাটক দেখতে আমাকে ডেকেছেন। নিজ হাতে নাম লিখে তাঁর *গোরা* বইখানা আমাকে উপহার দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৯ সালের ৬ই জানুয়ারি শান্তিনিকেতন থেকে সুফিয়া কামালকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন– 'কল্যাণীয়াষু, কলকাতায় যাওয়া ঘটল না। যাবার আর সমস্ত সুবিধাই আছে, কেবল শরীরটা হর্ত্তাল করে বসে আছে, তার চলাফেরা বন্ধ। সংবাদপত্র থেকে মাঝে মাঝে খবর পাই যে, আমি নানা সভা-সমিতিতে সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত– তার থেকে বুঝতে পারি, আমার খবর অন্যেরা আমার চেয়ে

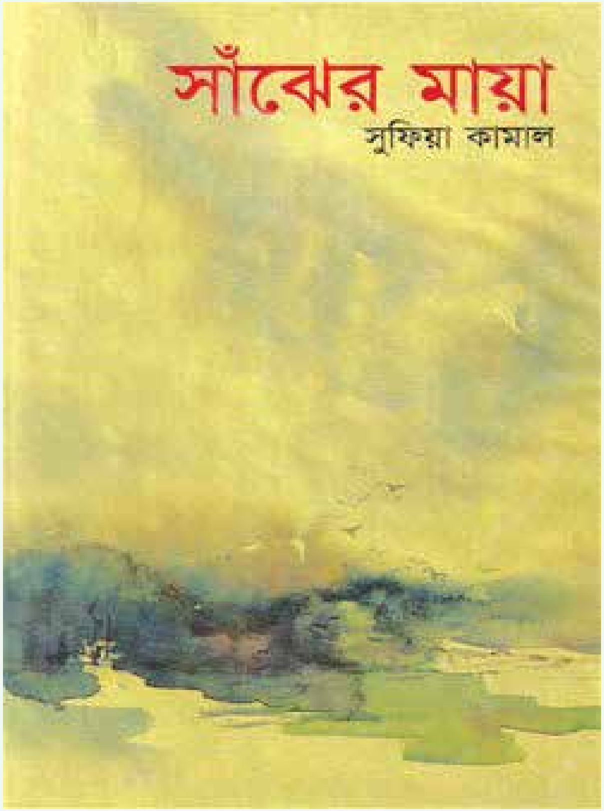

বেশী জানে। যাই হোক, খবরের কাগজওয়ালারা যাই বলুন, আমি খুব বিশ্বস্ত সংবাদদাতার কাছ থেকে খবর জানি যে, রবীন্দ্রনাথের শীঘ্র কলকাতায় যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তুমি রেঁধে খাওয়াতে চেয়েছ সেই কথাটি আমি এই দূরে থেকেও মনে রাখব। তুমি ভুলবে বলে আশংকা করছি।'

সুফিয়া কামালের জীবনে ১৯৩৮ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখটি ছিল স্মরণীয়। কারণ ওইদিন রবিঠাকুর তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল– 'কল্যাণীয়া সুফিয়া, তোমার কবিত্ব আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান ঊর্ধ্বে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

সুফিয়া কামালের জীবনকাল পরিব্যাপ্ত ছিল ৮৮ বছর। ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দীর্ঘজীবনে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানীসহ গত শতাব্দীর প্রায় সব যুগপুরুষকেই। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ছিল তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক। কাজী নজরুল ইসলাম সুফিয়া কামালকে বোন বানিয়েছিলেন। সুফিয়া কামালকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামেরও দুটো করে চারটি চিঠির হদিস পাওয়া যায়। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে আরও চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি চিঠিগুলো হারিয়ে ফেলেছিলেন। কাজী নজরুলের লেখা চিঠি হারানো সুফিয়া কামালের জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখগুলোর একটি বলে উল্লেখ করেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে।

সুফিয়া কামালের বিয়ে হয় মাত্র ১১ বছর বয়সে, মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে। বরিশাল থেকে তখন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। নাম *তরুণ*। অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইয়ের ছেলেরা বের করেছিলেন পত্রিকাটি। সেখানে তাঁর স্বামী একটি লেখা নিয়ে জমা দেন। অবাক করা বিষয়, সেটি কোনো কবিতা ছিল না, ছিল একটি গল্প। গল্পের নাম 'সৈনিক বধূ'। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ-পনেরো। এরপর থেকে *তরুণ* পত্রিকায় তিনি গল্প, কবিতা লিখতেন।

পত্রপত্রিকায় লেখালেখির কারণে বাড়িতে তাঁর দুর্নাম রটে গেল। বড়োমামা চাইতেন না বাড়ির কোনো মেয়ের নাম বাইরে প্রকাশিত হোক, তাও আবার বাংলা কাগজে। সুফিয়া কামালের নানা লেখালেখি করতে একেবারে বারণ করে দিলেন। তিনিও লেখালেখি বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু, ছোটোমামা তাঁর একটি লেখার খাতা নিয়ে গেলেন ঢাকায়। *অভিযান* নামের একটি পত্রিকায় তাঁর কবিতা জমা দিলেন। কবি নজরুল তখন ঢাকায় এসেছেন, মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্মেলনে। সুফিয়া কামালের কবিতা পড়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। সুফিয়া কামালকে চিঠিতে লিখলেন, 'মুসলিম মেয়ে এ রকম একটা কবিতা লিখেছে, এটা প্রশংসার কথা। এত সুন্দর কবিতা তোমার, প্রকাশিত হচ্ছে না, এটা বড়ই দুঃখের কথা।'

১৯২৬-১৯২৭ সালের পর সুফিয়া কামাল পরিবারের সঙ্গে কলকাতা চলে যান। সেখানেই একদিন তাঁদের বাড়িতে এসে হানা দেন কাজী নজরুল ইসলাম। ঢুকে যান একেবারে অন্দরমহলে। সুফিয়া কামালের মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম এবং সুফিয়া কামালকে বোন বলে সম্বোধন করলেন। বিদ্রোহী কবি সুফিয়া কামালকে কবিতা লিখতে উৎসাহ দেন এবং প্রতিদিন অন্তত একটি করে কবিতা লিখতে বলেন। কবিতা দিতে বলেন *সওগাত* পত্রিকায়। সেই থেকে সুফিয়া কামালের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি। ১৯৩০ সালে *সওগাত*- এর প্রথম নারী সংখ্যায় ছবিসহ তাঁর লেখা ছাপা হলো। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এটা ছিল বৈপ্লবিক ঘটনা।

এ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমাদের বাড়িতে তিনি প্রায়ই আসতেন। আলোচনা হতো মুসলিম লেখক ও লেখিকাদের নিয়ে। তিনি বলতেন, 'সমস্ত বাধা-নিষেধ ঠেলে যে বের হয়ে আসছে, তাকে রোধ করার শক্তি নেই কারুর। সেই প্রকাশই সত্য-প্রকাশ, তাই অবিনশ্বর।' একদিন আমার স্বামী তাঁকে বলেছিলেন– 'এ বিষয়ে আমি কিন্তু আপনার বোনকে বাধা না দিয়ে উৎসাহই দিয়ে আসছি। আশা করি, আপনি এজন্য আমাকে তারিফ করবেন।' নজরুল একটুখানি হেসে বললেন, 'আমার তারিফ চাও? করতে পারি। কিন্তু তুমি কি ভেবেছ, তোমার উৎসাহ না পেলে সুফিয়া লিখতে পারত না? বা বাধা দিলে ওকে ঠেকাতে পারতে? বরং বাধা দাওনি তাই ভালো করেছ। যে ঝর্ণা বয়ে চলেছে, তাকে বাধা দিলে সে তোমাকে শুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যেতো যে'।"

সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া*'র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'কয়েক বছর আগের কথা। কল্যাণীয় কবি সুফিয়া এন. হোসেন হেরেমে বন্দী বালিকা, তার স্বর্গীয় স্বামী আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু সৈয়দ নেহাল হোসেন সাহেব কয়েকটি কবিতা দেখে দিতে বলেছিলেন। বললেন, তার স্ত্রীর লেখা। আমার বিশ্বাস হলো না যে তা কোন মুসলিম বালিকার লেখা। আমারই উৎসাহে ও অনুরোধে বোরকা ও নেকাবের অন্ধ স্তূপ থেকে সেই কবিতার মুকুলগুলো সলজ্জ শংকায় আত্মপ্রকাশ করল।... কবি সুফিয়া এন. হোসেনের বাংলার কাব্য গগনে-উদয় সন্ধ্যা তারা হিসেবে। এ সন্ধ্যা কৃষ্ণ তিথির সন্ধ্যা নয়। শুক্র চতুর্দশীয় সন্ধ্যা। প্রতিভার পূর্ণ চন্দ্রাবির্ভাবের জন্য বুঝি; নিশীথের পেয়ালায় চাঁদনীর শিরাজীর এ রাত বুঝি কানায় কানায় পুরে উঠবে। বিরহ যে ক্ষতি নয়, *সাঁঝের মায়া*'ই তার অনুপম নিদর্শন। অস্ত তোরণ হতে আমি যে বিস্মিত মুগ্ধ চিত্তে অভিনন্দন জানাতে পারলাম, এ আনন্দ আমার বাকী জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' (১লা শ্রাবণ ১৩৪৫)।

কাব্য রচনার পাশাপাশি সুফিয়া কামাল নারী জাগরণ, শিশুর মানবিক বিকাশ, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেগুলো হলো– বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংসদ, মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড, রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ, কচিকাঁচার মেলা এবং ছায়ানট।

লেখালেখি, সাংগঠনিক কাজকর্মের পাশাপাশি সুফিয়া কামালের একটি বিশেষ দিক হয়ত অনেকের অজানা। সেটি হলো– তিনি ৪০ বছরেরও অধিক সময় সব শ্রেণি-পেশার মানুষদের স্বপ্নে পাওয়া হাঁপানির ওষুধ দিয়েছেন। সপ্তাহের প্রতি শনি-মঙ্গলবার সকাল বেলা ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের ৬৫৮/এ নম্বর বাড়িতে তিনি ওষুধ বিতরণ করতেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এমনকি বিদেশ থেকেও অনেকে এসে এই ওষুধ নিয়ে যেতেন। তাঁর বয়স যখন ৮২ বছর, তখনও তিনি রোগীদের নিয়মিত ওষুধ দিতেন।

সুফিয়া কামালের জীবন শুধু দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর চিন্তা, আদর্শ ও কর্ম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিস্তৃত ছিল। বিভিন্ন সময় তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। এসব সফরের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছেন বাংলা সংস্কৃতি, ভাষা ও নারী জাগরণের বার্তা। তিনি খুব সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক ও সমাজকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য তিনি ভ্রমণ করেছেন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ।

সোভিয়েতের দিনগুলি বইয়ে সুফিয়া কামাল লিখেছেন– 'হেড ফোন লাগিয়ে নানা দেশের নানা ভাষা শুনলাম। ইংরেজি থেকে কিছু কিছু নোটও করতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ পরে মাথা কেমন গুলিয়ে উঠল— শুনব, না দেখব, না নোট করব? আশপাশে সবারই দেখি সেই দশা। হাতের কলম থেমে গেছে সবারই। সবাই চেয়ে আছে মঞ্চের দিকে। ... দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে মহাকাশচারিণী ভ্যালেনটিনা তেরেশকোভা। পরম বিস্ময়ের যে, সে সামনে। মহাকাশচারিণী এই অল্প বয়সের ক্ষীণাঙ্গী একটি মেয়ে। জবরদস্ত বিরাট বিপুল কেউ নয়। কী আশ্চর্য! আমার মেয়ের মতো। সে কখনও বলে চলেছে তার অনায়াস আকাশ ভ্রমণ, মহাশূন্যের দৃশ্যাবলী এবং অভিজ্ঞতার কথা। বেলা প্রায় ২টা, এ বেলার অধিবেশন শেষ। ভ্যালেনটিনা মঞ্চ থেকে নামবে। বিপুল করতালির শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। সে চলে যাচ্ছে। আমি আর অপেক্ষা করলাম না। পাশের দরজা দিয়ে ভিড় ঠেলে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। রক্ত যেন আমার কথা কয়ে উঠল। শান্ত মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে সেও আলিঙ্গন করল। পরিচয় দিলাম। ব্যাগে শঙ্খের আংটি ছিল, ওর আঙ্গুলে পরিয়ে দিলাম। তখন যদি আরও মহামূল্যবান কিছু পেতাম, ওকে দিতে পারলে খুশী হতাম। বাংলাদেশের মেয়েদের তরফ থেকে মেয়েদের হয়ে ওকে অভিনন্দন জানালাম। বললাম, শ্যামল কোমল পূর্ব পাকিস্তানে একবার আস না কেন। ও ধন্যবাদ জানাল। বলল, সব মেয়েই চেষ্টা করলে তার মতো মহাশূন্যচারিণী হতে পারে, কোনই কঠিন কাজ নয়।'

সবে জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে আষাঢ় এসেছে। ফুটতে শুরু করেছে কদম। এমনই এক কদমফোটা আষাঢ়ের ১০ তারিখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশালের বাকেরগঞ্জের শায়েস্তাবাদ নবাব পরিবারে জন্ম সুফিয়া কামালের। শৈশবে পিতার অনুপস্থিতির কারণে বেড়ে ওঠেন নানাবাড়িতে।

পরিবারে নারীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ছিল সীমিত। তারপরও মায়ের সহায়তায় তিনি বাংলা শেখেন এবং নানাবাড়ির গ্রন্থাগার থেকে সাহিত্য জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯২৬ সালে *সওগাত* পত্রিকায় 'বাসন্তী' কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর সাহিত্যযাত্রা। পরে *কেয়ার কাঁটা* (১৯৩৭) ও *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮)সহ বহু কাব্য ও গদ্যগ্রন্থে তিনি মানবিকতা, স্বদেশ চেতনা ও নারীর আত্মমর্যাদাকে শিল্পরূপ দেন। দেশভাগের পর ঢাকায় এসে ভাষা আন্দোলন, রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধের প্রতিবাদ, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধসহ নানা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে নারী সমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী হয়ে গড়ে তোলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

সুফিয়া কামালের লেখা কবিতার উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে– *সাঁঝের মায়া*, *মায়া কাজল*, *মন ও জীবন*, *প্রশস্তি ও প্রার্থনা*, *উদাত্ত পৃথিবী*, *দীওয়ান*, *অভিযাত্রিক*, *মৃত্তিকার ঘ্রাণ*। গল্পের বই– *কেয়ার কাঁটা*। ভ্রমণকাহিনি– *সোভিয়েতের দিনগুলি*। স্মৃতিকথা– *একাত্তরের ডায়েরী*। আত্মজীবনীমূলক রচনা– *একালে আমাদের কাল*। শিশুতোষ বই– *ইতল বিতল* এবং *নওল কিশোরের দরবারে*। অনুবাদ– *সাঁঝের মায়া*– *বলশেভনি সুমের্কি* (রুশ)।

তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য ছড়া ও কবিতাগুলো হলো– 'তুলি দুই হাত করি মোনাজাত/হে রহিম রহমান/কত সুন্দর করিয়া ধরণী/মোদের করেছ দান,/গাছে ফুল ফল/নদী ভরা জল/পাখির কণ্ঠে গান/সকলি তোমার দান' (প্রার্থনা), 'আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা/তোমরা এ যুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা/আমরা যখন আকাশের তলে ওড়ায়েছি শুধু ঘুড়ি/তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি' (আজিকার শিশু), 'গোল করো না গোল করো না/ছোটন ঘুমায় খাটে/এই ঘুমকে কিনেত হলো/নওয়াব বাড়ির হাটে/সোনা নয় রুপা নয়/দিলাম মোতির মালা/তাইতো ছোটন ঘুমিয়ে আছে/ঘর করে উজালা' (ইতল বিতল), কিংবা "হে কবি! নীরব কেন ফাল্গুন যে এসেছে ধরায়;/বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?"/কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি– "দখিন দুয়ার গেছে খুলি?/বাতাবী নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?/দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?" (তাহারেই পড়ে মনে), 'সবুজ পাতার খামের ভেতর/হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে/কোন্ পাথারের ওপার থেকে/আনল ডেকে হেমন্তকে?/আনল ডেকে মটরশুঁটি,/খেসারি আর কলাই ফুলে/আনল ডেকে কুয়াশাকে/সাঁঝ সকালে নদীর কূলে' (হেমন্ত), 'এ ধরিত্রী মাতা ও দুহিতা/সর্বংসহা, শান্ত, অনিন্দিতা/তাই ত দুহিতা তার ভঙ্গুর মাটির পাত্র ভরি/ যোগায় ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার পানীয় ওষ্ঠে ধরি/নারী সে বিচিত্র রূপে তার/গৃহে ও বাহিরে করে কর্মক্ষেত্র প্রসারি আবার/জননী স্তন্যদানে, ভগিনী কৈশোর খেলা সাথী/পুরুষের সন্ধ্যায় সে বধূরূপে জ্বলে গৃহে বাতি/কঠোর সংগ্রামময় জীবনের অন্ধকার রাতে/আশার বর্তিকা নিয়ে হাতে' (নারী ও ধরিত্রী)। এছাড়াও সুফিয়া কামালের রয়েছে জনপ্রিয় অসংখ্য ছড়া ও কবিতা।

এসব কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বেগম রোকেয়া পদক প্রভৃতি। একাধারে কবি, সংগঠক, সংগ্রামী নারী এবং মানবতার কণ্ঠস্বর বেগম রোকেয়ার 'ফুলকবি' সুফিয়া কামাল মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর।

নারী কবি হিসেবে নয়, সুফিয়া কামাল নিজগুণে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির কবি হিসেবে খ্যাতিমান। শুধু কবি হিসেবে নয়, সমাজসেবক হিসেবেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী। নারীমুক্তি আন্দোলন থেকে তাঁর অবদান মুক্তবুদ্ধিচর্চা, মানবাধিকার পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে স্বদেশের নানা প্রয়োজনে তিনি সব সময় সোচ্চার থেকেছেন। যখনই প্রয়োজন মনে করেছেন অধিকার আদায়ের দাবিতে নেমেছেন রাজপথে। তাঁর সংগ্রামী জীবন আজও মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়। জোগায় সাহস।

ইমরুল ইউসুফ: উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শাহাদত বার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে তাঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শ্রদ্ধা নিবেদন বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ৩০শে মে বেলা ১১টায় শেরেবাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি। এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ ও মহিলা ও শিশু এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এছাড়া দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, মীর আবদুস সালাম, মাসুম আহমেদ তালুকদার, সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল, খায়রুল কবির খোকন, হাবিবুর রশীদ হাবিব, আমিনুর হক, এসএম জাহাঙ্গীর, রফিকুল আলম মজনু, শিরিন সুলতানা, সুলতানা আহমেদ, হেলেন জেরিন খান, আরিফা সুলতানা রুমা, মীর সরফাত আলী সপু, রফিকুল ইসলাম, শফিকুল আলম মিল্টন, রফিকুল ইসলাম বাচ্চুসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণের পর প্রধানমন্ত্রী ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে মাজার প্রাঙ্গণে জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের উদ্যোগে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিএনপি ও এর সহযোগী এবং অঙ্গসংগঠনগুলো বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালন করে। রাষ্ট্রপতি থাকাকালে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে একদল বিপথগামী সেনাসদস্যের গুলিতে শহিদ হন জিয়াউর রহমান। বিএনপি দিনটি তাঁর 'শাহাদত দিবস' হিসেবে পালন করে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে ভোরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, গুলশানে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়সহ সারা দেশের দলীয় কার্যালয়গুলোতে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। একই সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়।

প্রতিবেদন: আলেয়া রহমান

ফসল কাটার গান

কাজী আলিম-উজ-জামান

ও কি খুলনার নাহরি তুমি ভাবিয়া করছ কী/
ধান বেচিয়া কিন্যা আনব তোমার ফুলতোলা শাড়ি।

কাটা ধানের আঁটি বাঁধতে বাঁধতে ভাওয়াইয়ার সুরে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ফুলবাড়ী গ্রামের মাঠে গানটি গাইছিলেন কৃষিশ্রমিক আবু বাক্কার। রাজশাহীর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আবুল কালাম মুহাম্মদ আজাদ পেশাগত কাজে গিয়েছিলেন ঐ মাঠে। আর সেখানে গিয়ে তিনি মাথায় গামছা পেঁচানো শ্মশ্রুমণ্ডিত আবু বাক্কারের মুখে এই গান শুনতে পান। এ নিয়ে তিনি প্রতিবেদনও করেছিলেন। এই লেখকের সঙ্গেও তার এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ হয়েছে। কালাম জানালেন, ছবি তোলার সময় ফিক করে হেসে দিয়েছিলেন আবু বাক্কার। আবু বাক্কারের গানের পরের দুই লাইন ছিল এ রকম– 'ওই শাড়ি পইরা যাইবা তুমি বাবা-মার বাড়ি/ ওরে গ্রামের লোকে দেইখ্যা বলবে তোমায় খুলনার নাহরি।' আবু বাক্কারের এই গানকে বলা যেতে পারে ফসল কাটার গান অথবা ধান কাটার গান। অনেক মেহনতের পাকা ধান কাটার সময় কৃষক কিংবা কৃষিশ্রমিকের মন আনন্দে ভরে ওঠে। তখন তার ভেতর থেকে গানের কথা তৈরি হয়। চারপাশের প্রকৃতির শোভা এই কথায় সুর তোলে। এভাবেই তৈরি হয় ফসল তোলার গান।

পাবনা-রাজশাহীর জলপথে নৌকাভ্রমণের সময় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনই একটি গান শুনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *লোকসাহিত্য* গ্রন্থের 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন, "এক দল লোক বাঁশের বাখারি দিয়ে বইঠা বাইতে বাইতে গান গেয়ে যাচ্ছিলেন। গানটি ছিল এ রকম, 'যুবতী ক্যান বা কর মন ভারী/ পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা দামের মোটরি'।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'গানের এই দুটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল।'

অতি সম্প্রতি ফসল কাটার আরেকটি গান যেন আবিষ্কৃত হলো। এক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন নাটোরের সাংবাদিক মুক্তার হোসেন। তিনি গিয়েছিলেন নাটোরের সিংড়া উপজেলার সাতপুকুরিয়া এলাকার চলনবিলে। সেখানে শ্রমিকেরা ধান কাটছিল আর গাইছিল। গানটি এ রকম:

এক বাওই কালা রে,
আরেক বাওই ধলা রে,
আরেক বাওয়ের কপালে লাল টিপ।
রং-বেরঙের বাওই রে,
ধানের খেতে পড়ে রে,
এই খেতে আর বুনব না রে ধান।
আমরা যে যুবতী নারী,
বাওই কি খেদাইতে পারি,
বদনে চুয়ায়ে পড়ে ঘাম।
ওই খেতে আর বুনব না রে ধান...

ধানকাটা শ্রমিকের দলপতি শোয়াইব মালিথা যখন সুমধুর এই

গান করছিলেন, আহা, আহা বলে গানের আবেদনে সাড়া দিচ্ছেন অন্য শ্রমিকেরা। সুরের ছন্দে ছন্দে তাদের হাতে দুর্বার গতিতে কাটা পড়ছিল আঁটি আঁটি পাকা ধান। শোয়াইব মালিথা জানান, 'এক বাওই কালা রে' গানটি তারই লেখা। এখানে বাওই মানে বাবুই। বাবুই পাখির ওপর অভিমান করেই গানটি লিখেছেন তিনি। ধানের মৌসুমে বাবুই পাখি অনেক ধান খেয়ে নেয়।

বাংলা সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির গবেষক শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর* বইয়ে ধান কাটার গান নিয়ে বলেছেন, খেতে পাকা ধান কাটার সময় কোনো কোনো অঞ্চলের কৃষকদের একসঙ্গে যে গান গাইতে শোনা যায়, তাকে ধান কাটার গান বলা হয়। এ গানকে তিনি ফেলেছিলেন কর্মসংগীতের গোত্রে। এও বলেন, এই শ্রেণির গান বিশেষ শুনতে পাওয়া যায় না। 'প্রামাণিকতা সংশয়াতীত নহে' উল্লেখ করে তিনি একটি গানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'হারে আমার কাতিশাল, বছর বছর থাকিস রে বহাল...।'

এবার আরেকটি ফসল কাটার গান শুনে আসা যাক। এই গানটির রচয়িতা বগুড়ার নন্দীগ্রামের সাজু মিয়া। বগুড়ার আলোকচিত্র সাংবাদিক সোয়েল রানা আমাকে এই গানের খবর জানিয়েছেন। এই গানটা একটু ভিন্ন রকম।

সাজু মিয়ার গাওয়া গানের কলিগুলো এমন– 'এখনো খারাপ কেহ কবার পাইনি। শ্বশুরের সঙ্গে গিয়েছিলাম মহিলা হলে ছবি দেখতে। কত লোক দেখছে বটে, কত লোক দেখছে বটে মাইন করেনি। এখনো খারাপ কেহ কবার পাইনি...।'

আমাদের হাওর অঞ্চল ধানের আধার। সেখানে নিশ্চয় আছে ধান কাটার গান। সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের তিনজন সাংবাদিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তারা বললেন, এবার অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ফসলহানি হয়েছে। কৃষকেরা ভালো নেই। তাদের মনে গান নেই। সে কথা হয়ত ঠিক আছে। কিন্তু হাওরে ফসল কাটার নিশ্চয় গানও আছে। তেমনিভাবে যশোর, খুলনা অঞ্চলেও ফসল কাটার গান থাকতে পারে।

ফসল কাটার গানের প্রসঙ্গ এলে আমাদের মনে আসে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'দ্য সলিটারি রিপার' কবিতায় মাঠে একাকী স্কটিশ তরুণীর গান গেয়ে শস্য কাটার দৃশ্য।

কবি একটি নির্জন উপত্যকায় এক তরুণীকে দেখেন। সে একা ফসল কাটছে এবং গান গাইছে। তার গানের সুর এত মর্মস্পর্শী যে উপত্যকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। কবি নাইটিংগেল কোকিলের সাথে তুলনা করে বলেন যে এই গান তাদের চেয়েও মধুর। তিনি বুঝতে পারেন না গানের কথা কী, কিন্তু অনুমান করেন হয়ত পুরনো দুঃখের কথা বা দৈনন্দিন জীবনের কথা। শেষে কবি চলে যান, কিন্তু সেই গান তার হৃদয়ে চিরকালের জন্য ধ্বনিত হয়ে থাকে।

ধান কাটার গান লিখে স্মরণীয় হয়ে আছেন অমর গীতিকবি সলিল চৌধুরী,

হেই সামালো ধান হো
কাস্তেটা দাও শাণ হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেব না আর দেব না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।

ফসল কাটার গান মানুষের শ্রম, আনন্দ, দুঃখ আর আশার এক অপূর্ব মিশ্রণ। বিশেষ করে বাংলায় ধান কাটার সময় কৃষকেরা গান গেয়ে ক্লান্তি ভোলেন। এই গানগুলো শ্রমের গান, উৎসবের গান এবং জীবনের গান।

কাজী আলিম-উজ-জামান: সাংবাদিক, কবি ও গবেষক, alim.zaman@prothomalo.com

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৭০.৭৩ শতাংশ

চলতি বছরের ১৭ই ফেব্রুয়ারি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ৭টি মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৭০ দশমিক ৭৩ শতাংশ। ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এসব মন্ত্রিসভা-বৈঠকগুলোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ২১শে মে-২০২৬ মন্ত্রিসভার ৮ম বৈঠকে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে সচিবালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মন্ত্রিসভার ৮ম বৈঠকে জাপানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব, ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্সে (আইবিসিএ) যোগদান এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতে জিসিএম-ন্যাপ (২০২৬-২০৩০) অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভা বৈঠকে জাপান সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'ট্রান্সফার অব ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি' শীর্ষক চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে।

প্রতিবেদন: জেসিকা হোসেন

শীর্ষ শিষ্যঃ লালন দুহিতা দেবোরা কিউকারম্যান

মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান

ও মন মানুষ হইতে চাও,
জাতি ধর্ম ছাইড়া দিয়া সরল দেশে যাও

ফ্রান্স অ্যাম্বেসির সামনে তার সাথে আমার প্রথম দেখা। ছিপছিপে গড়নের সুন্দর চেহারার মানুষ তিনি। মুখাবয়বে মায়া ও সরলতার ছাপ স্পষ্ট। আর দেহে জড়িয়েছেন একেবারে সাদা রঙের বিশেষ পোশাক। একজন সুন্দর চেহারার বিদেশিনি গায়ে জড়িয়েছেন আমাদের আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের বিশেষ এক গোত্রের পোশাক। এসব দেখে আমার মনে নানারকম প্রশ্নের উদ্রেক হলো। সবকিছু রহস্যময় লাগছে। এদিকে অ্যাম্বেসির গেইট থেকে শুরু হওয়া আমাদের লাইনটা ইতোমধ্যে অনেক লম্বা হয়ে গেছে। সম্ভবত তিনি আমাদের লাইনের সামনে পৌঁছে গেছেন। অথবা তিনি বিদেশি নাগরিক বিবেচনায় একটু খাতির করে উনাকে সামনে জায়গা দেওয়া হয়েছে। সামনে হলেও তিনি আমাদের লাইনের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আর আমি আমাদের লাইনের ৫-৬ জনের পেছনে। লাইনের আগে-পিছে সবাই একই ধরনের মানুষ। তিনিই শুধু ভিন্ন। তাই আমার মনে এত প্রশ্ন।

সময়টা গ্রীষ্মের দুপুর, আকাশে প্রখর রোদ। কোট-টাই পরিহিত আমি গরমে নাভিশ্বাস হয়ে যাচ্ছি। এখানে কোথাও একটু ছায়া নেই। বসার কোনো জায়গাও পাচ্ছি না। বার বার লাইনের গতিবেগ নির্ণয় করছি আর আশপাশে কী হচ্ছে তা দেখছি। এরই মধ্যে তার সাথে আমার কয়েকবার চোখাচোখি হলো। ভাবলাম উনি বিরক্ত বোধ করলেন কি না তাই নিজেকে সামলে নিলাম। এদিকে লাইন কোনোমতেই এগোচ্ছে না। সামনের কার জানি ডকুমেন্টস সংক্রান্ত সমস্যা হয়েছে শুনে সবাই যার যার ডকুমেন্টস চেক করছে। আমিও আমার ডকুমেন্টসগুলো আবার চেক করে নিলাম। ফাইল গুছিয়ে সামনে তাকাতেই তার সাথে আবার চোখাচোখি হলো। এবার আর ভুল করলাম না। আমি তাকে সালাম দিলাম। উনি উত্তর দিলেন কি না তা শুনতে পেলাম না। তবে যেটা শুনলাম তার নাম 'জয়গুরু'। বুঝার তো আর বাকি রইল না যে তিনি লালন ভক্ত মানুষ। এবার আমার কাছে রহস্যের জট কিছুটা খুলতে লাগল। নিজে নিজে অনেক প্রশ্নের সমাধান করে একটা অ্যানালাইসিস করে ফেললাম।

তাকে আপা বলব না ম্যাডাম বলব স্থির করতে পারছি না। আগে-পিছে না ভেবেই জিজ্ঞেস করলাম— কেমন আছেন। তিনি উত্তর দিলেন, ভালো আছি। এবার আমাকেও বললেন, 'আপনি কেমন আছেন।' আমিও ভালো আছি বললাম। এছাড়াও পরিচিত মূলক সংক্ষিপ্ত কিছু আলাপ হলো। প্রতিবারই তিনি সুন্দর সাবলীল প্রাঞ্জল বাংলায় উত্তর দিচ্ছেন। ভুলেও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করছেন না। ইংরেজিতে দুই-একটা শব্দও না। ভিসা, অ্যাপ্লিকেশন, অ্যাম্বেসি প্রভৃতি কিছু মৌলিক শব্দ ছাড়া। বিদেশি কেউ ভাঙা ভাঙা বাংলা বললে সেটা আমাদের কাছে রীতিমতো হাসির খোরাক। আবার কেউ কেউ পুরো একটি বাক্য বা অনুচ্ছেদ গুছিয়ে একটানা বলতে পারলেও তার মধ্যে উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত অনেক বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। যেমন— আমা আপনারা কেমন আছু অথবা আমি ওখন কিচু কথা বলবে না ইত্যাদি। কিন্তু তিনি এত সুন্দর করে বাংলা কীভাবে বলা

শিখলেন বর্তমানে এটাই আমার কৌতূহল।

কৌতূহল চেপে না রেখে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বিদেশি হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এত সুন্দর করে বাংলা বলতে পারেন। তিনি বললেন, 'আমি শিখে নিয়েছি।' এরপর জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় থাকেন? তিনি বললেন, কুষ্টিয়ার প্রাগপুরে। প্রাগপুর দৌলতপুর উপজেলার একটি গ্রাম। আরো জানালেন, উনি ফ্রান্সের নাগরিক। তার জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং লেখাপড়া ফ্রান্সেই। বাংলাদেশে আসার আগে ফ্রান্সে তার পেশা ছিল

গবেষণা। ধর্ম, সংস্কৃতি ও সুফিবাদের ওপর তিনি গবেষণা করতেন। তিনি একজন ভালো ট্রান্সলেটরও বটে। দেশে থাকাকালে ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের কাজও করেছেন। শুধু তাই নয়, দেবোরা দর্শনে এমএ এবং ইয়োগার শিক্ষক ছিলেন। বাবা-মা ছাড়াও তাদের পরিবারে রয়েছে দুই বোন-এক ভাই। ভাইবোনের মধ্যে তিনি সবার বড়ো। তাদের কথা মনে পড়লে মাঝে মাঝে তিনি ফ্রান্সে যান। কয়েকদিন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আবার চলে আসেন বাংলাদেশে।

আমি বললাম, কতদিন ধরে আছেন বাংলাদেশে? তিনি দীর্ঘ স্বরে উত্তর দিলেন, 'অনেক বছর'। আমাদের আলাপও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, বড়ো হচ্ছে কথার মালা। আলাপের দীর্ঘতার প্রয়োজনে এবার জিজ্ঞেস করলাম মূল প্রশ্ন। বাংলাদেশে দীর্ঘ অবস্থানের কারণ কী? চাকরি, ব্যাবসা, লেখাপড়া, গবেষণা, সার্ভে, এনজিও? কোনটা? তিনি বললেন, 'এসব কিছুই না। যদিও প্রথমত আমি বাংলাদেশে এসেছিলাম গবেষণার কাজেই। মূলত আমি এসেছিলাম শান্তির খোঁজে। এর আগে আমি বিশ্বের অন্তত পনেরোটি দেশ ঘুরে বাংলাদেশে এসেছি। অবশেষে বাংলাদেশে এসে মনের কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছি।' কোনো বিদেশি নাগরিক এত দেশ ফেলে, উন্নত সভ্যতাসম্পন্ন দেশের আধুনিক জীবনের সৌখিনতা রেখে, অগ্রসরমান প্রযুক্তির ব্যবহারের হাতছানি এড়িয়ে বাংলাদেশে এসে তার মনের শান্তি খুঁজে পেয়েছে– এটাও কম কীসের। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার কিন্তু যথেষ্ট ভালোই লাগল।

যদিও বেশ কয়েক বছর ধরে অনেক বিদেশি ছেলেমেয়ে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের প্রেমের টানে বাংলাদেশে এসেছেন। এ নিয়ে দেশের শীর্ষ-অশীর্ষ পত্রিকা বা টেলিভিশনগুলোতে বিভিন্ন রকম সংবাদও প্রচার অনেক। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কয়েকদিন থেকে নিজ নিজ দেশে চলেও গেছেন। কিন্তু স্থায়ীভাবে থেকে গেছেন দেবোরা কিউকারম্যান। কয়েকজন ব্যতিক্রমের মধ্যে তিনি একজন। কারণ তিনি প্রথাগত প্রেম ছাড়াও ভিন্ন এক প্রেমের টানে সুদূর ফ্রান্স থেকে এসে স্থায়ী হয়েছেন বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার প্রাগপুরে।

আবার আমাদের আলাপ শুরু হলো। কথায় কথায় তিনি জানালেন, বাংলাদেশে তার স্থায়ী হওয়ার কথা। ২০১৬ সালে বাউল সম্রাট লালন শাহর জীবনদর্শন নিয়ে জানতে বাংলাদেশে আসেন দেবোরা কিউকারম্যান। প্রথম কিছুদিন ঢাকায় অবস্থান করেন। তারপর সাধুসঙ্গ দেখতে যান কুষ্টিয়ার লালন শাহর আখড়ায়। সাধুসঙ্গ চলাকালেই তার কাছে ঐশ্বরিক মেসেজ আসে যে, 'এটাই সেই জায়গা যা তুমি খুঁজছ। এটাই তোমার বাড়ি, এখানেই তুমি সব কিছুর সন্ধান পাবে। এখানেই তুমি থাকো।' ঐশ্বরিক বার্তা আসার পর তিনি আর অন্য কিছু ভাবেননি। ঐশ্বরিক সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে কুষ্টিয়ায় থেকে গেছেন। আত্মসমর্পণ করেছেন আধ্যাত্মিক সম্রাট লালন সাঁইজির দেখানো পথে। লালন দর্শনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সাঁইজির অনুসারী বাউল-ফকিরদের এই জীবনাচারে খুঁজে পেয়েছেন পরম প্রশান্তি। হয়ে গেছেন সরল দেশের বাসিন্দা।

যেখানে জাতপাতের কোনো ভেদ নেই, নেই কোনো কঠোর ধর্ম নীতি-শাস্ত্র, আছে শুধু মানুষ ভজার সাধনা। যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় মানুষ ভজলেই সোনার মানুষ হওয়া যায়। মানুষ ভজলেই দিব্যজ্ঞানে জগতের সবকিছু দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই এবং মানুষ গুরুই যাদের নিষ্ঠা। যারা সবসময় সাধু চরণ ধুলি পাবার অক্লান্ত প্রত্যাশায় থাকে। চাতক যেমন মেঘের সন্ধানে চেয়ে থাকে ঠিক তেমন। আবার কেউ কেউ গুরুর কাছে তার চরণদাসী হওয়ার আকুল আবেদন করে থাকে। এদের মতে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। তাই এরা কখনো কুতর্কের দোকান খুলে না। এদের কাছে নদী কিংবা বিল-বাঁওড়-খাল সর্বস্থলে একই এক জল। এরা সময়ের কাজ সময়ে করতে ভালোবাসে কারণ এরা জানে সময় গেলে সাধন হবে না। তাই এখানে অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয় এবং মহাযুগ সেদিনই উদয় হয়ে থাকে ইত্যাদি সব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথা। তাদের মতে সবই সাঁইজির কৃপা।

তাই লালন দর্শন আরো বিশদভাবে জানতে এবং তার সাধনাকে পরিপূর্ণ করার জন্য তিনি একজন সদগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য তিনি স্থানীয় একজন সাংবাদিককে অনুরোধ করলেন। সেই সাংবাদিকের মাধ্যমে তিনি তার গুরুর সন্ধান পান। তার গুরুর নাম প্রখ্যাত বাউল ফকির নহির শাহ। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি একসময় বিভিন্ন এনজিও'র সাথে সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সুবাদে কমিউনিকেশন চালিয়ে নেওয়ার মতো ইংরেজি বলতে পারেন। তাই তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। প্রথম প্রথম গুরুর সঙ্গে তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথাবার্তা চলত। গুরুর সঙ্গে পরপর সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনার একপর্যায়ে দেবোরা ফকির নহির শাহর ভক্ত হয়ে যান। এরপর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে দেবোরা একেবারেই বাংলা ভাষা জানতেন না। কিন্তু ভাষা

না জানলেও তিনি গুরুজির (ফকির নহির শাহ) সঙ্গে সাধুসঙ্গে গিয়েছেন। পরবর্তীতে সেখানে তিনি ২ সপ্তাহব্যাপী সাধুসঙ্গ করেছেন। সাধুসঙ্গে গিয়ে সেখানকার শৃঙ্খলা ও ভাব বিনিময়ের মধ্যে তিনি যে লালন দর্শন পেলেন, সেখানে ভাষার কোনো বিষয়ই ছিল না।

জানা গেল, তার গুরুর কাছেই আত্মিক শান্তি ও সৃষ্টি রহস্য খুঁজতে দীক্ষা নিয়েছেন ফ্রান্সের এই তরুণী। সাধনার এক পর্যায়ে গুরুর নির্দেশে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছেন। আর নাম পরিবর্তন করে হয়েছেন দেবোরা কিউকারম্যান থেকে দেবোরা জান্নাত। শুরু থেকেই তার গুরু নহির শাহ লালন দর্শন সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনা করতেন। তারপর সে লালন দর্শন সম্পর্কে আরো ভালোভাবে বুঝতে চাইলেন। তখন তার গুরু লালন ভাবাদর্শ গভীরভাবে বুঝার প্রয়োজনে তাকে বাংলা ভাষা শেখার পরামর্শ দিলেন। দেবোরা তার আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অল্প দিনেই বাংলা ভাষা শিখে ফেললেন। বাংলা শেখার পর তার সঙ্গে গুরুর এক অনন্য মাত্রায় ভাব বিনিময় হয়। এবার গুরু তাঁর নিজের দর্শনজ্ঞান আস্তে আস্তে দেবোরার মধ্যে দেওয়া শুরু করেন। গুরুর দয়া ও দানে সে এখন পুরোপুরি লালনের দেখানো পথের অনুসারী। এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করলাম যতবার আমি তার গুরুর বিষয়ে জানতে চাইলাম। আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে প্রতিবারই কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। আমার কাছে মনে হলো এর মাধ্যমে তিনি তার গুরুকে স্মরণ করলেন।

আমাদের সংলাপ জমে উঠেছে বেশ। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনছি। মনে হচ্ছে তিনি কথা বলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। এবার তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বিখ্যাত এক বাংলা প্রবাদের কথা, 'যেমন কর্ম তেমন ফল'– এটা জানেন? আমি বললাম, হ্যাঁ জানি। তিনি বললেন তিনি এটা খুব ভালো করে মানেন। কথা বলতে বলতেই তিনি বড়ো একটি নিশ্বাস ফেললেন এবং আমাকে বললেন, সাঁইজির দর্শনটাও অনেকটা এরকম। লালন সাঁইজির দর্শন যারা মানে, লালন দর্শন যারা সাধনা করে এবং যে যেমন সাধনা বা কর্ম করে সে তেমনই ফল লাভ করে। তিনি বললেন, স্রষ্টার সৃষ্টির সঙ্গে মিশতে হবে, জানতে হবে ও বুঝতে হবে। তবেই সৃষ্টির এ বিস্ময়কে জানা যাবে। কথাটা শেষ করে তিনি বিড়বিড় করে আরো কিছু বললেন, যা আমি বুঝতেই পারলাম না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমি লালন দর্শন সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। তবে লালন সাঁইজির প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে এবং এই পথে কিছুটা আকর্ষণ বোধ করি। তারপরও মনে মনে দেবোরার কথার ভাবার্থ খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। আর কী নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা যায় তাই ভাবছিলাম। তেমন কিছু না পেয়ে তাকে বললাম– ধর্ম আমাদের জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। পৃথিবীতে দশ হাজারের বেশি নানারকম ধর্ম রয়েছে। আমরা একেকজন একেক ধর্মের অনুসারী। আসলে

মানুষ, ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য বা বার্তা কী? উত্তরে তিনি বললেন, সাঁইজির নিকট ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়ো; ধর্ম কিংবা জাতপাতের মধ্য দিয়ে নয়, ঈশ্বরকে পেতে হলে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আর সন্তুষ্টির জন্য সুপথের সন্ধান জানা দরকার।

তিনি আরো বললেন, সাঁইজির কালামে আছে– 'সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন'। কিন্তু মন সহজে সুপথে চলবে না। তাই তো সাঁইজি বলে গিয়েছেন– 'মন সহজে কি সই হবা, চিরদিন ইচ্ছামনে আইল ডেঙ্গাইয়া ঘাস খাবা, মন সহজে কি সই হবা'। এর জন্য সাধনা দরকার। দরকার সদগুরুর। বুঝলেন? হ্যাঁ, আমি মনে মনে বুঝার চেষ্টা করছি। ভাবছি, এদের কাছে জীবন কত সহজ। আর আমাদের কাছে জীবনের কত বড়ো একটা পার্ট সম্পূর্ণ অজানাই রয়ে গেছে। অথচ আমরা সারাদিন সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, জাতিসংঘ, এসডিজি, এপিএ, এসিআর, সেভিংস কতকিছু নিয়ে মাথা ঘামাই। আর এরা কত সহজ আয়োজনে নিশ্চিন্তভাবে সুখী জীবনযাপন করছে। বুঝলাম– এটাই বোধহয় ভ্যারাইটি অব লাইফ।

একের পর এক আমাদের কথার পসরা দীর্ঘ হচ্ছে। এবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তথা ব্যক্তিগত জীবনের কড়চা নিয়ে প্রশ্ন করলাম। যা উত্তর পেলাম তার মর্মার্থ হলো, তিনি অবিবাহিত অবস্থায় বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি অবিবাহিতা হওয়ায় তার গুরু নহির শাহ দেবোরার বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। দেবোরার জন্য সাধন সঙ্গী খোঁজা শুরু করলেন। খুঁজতে খুঁজতে গুরুর মনে পড়ল তাঁরই আস্তানার বাসিন্দা আরেক শিষ্য রাজনের কথা। তিনি খুব মাটির মানুষ। চলনে-বলনে লালন লালন ভাব। নম্র ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ। অবশেষে গুরুর আদেশে দেবোরা জান্নাত সাধক রাজনকে বিয়ে করেছেন।

এ প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেবোরা কাকে যেন চোখের ইশারায় কাছে ডাকলেন। মুহূর্তের মধ্যে সাদা পোশাক পরিহিত শ্যামল বর্ণের ছিপছিপে গড়নের এক যুবক আমাদের সামনে এসে হাজির হলো। এ যেন সাক্ষাৎ লালন। দেবোরা পরিচয় করিয়ে দিলো– ও, রাজন। তিনিও আমাকে 'জয়গুরু' বলে

শুভাশিস জানালেন। প্রত্যুত্তরে আমিও এবার 'জয়গুরু' বলার চেষ্টা করলাম। এরপর দেবোরা রাজনকে আমার কথাও বললেন। আমরা পরস্পরকে স্বাগত জানালাম। উনি আমার সব কথার উত্তর দিলেন হাসিমুখে। যতদূর আন্দাজ করতে পারলাম তাতে বুঝলাম, দেবোরার চেয়ে রাজনের বয়স কিছুটা কমই হবে। তার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া আমার কাছে অতটা মাধ্যমিক বা উচ্চ পর্যায়ের মনে হলো না।

কিছুক্ষণ পর আমাদের আলাপে আবার যুক্ত হলো দেবোরা। বিয়ে নিয়ে কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, সংসার হলো সমাজ, সংসার হলো ঘর। সংসার হলো মনের মানুষকে নিয়ে ঘর ও সমাজে বসবাস। এমন চিন্তাচেতনা থেকে ঘর-সংসার করতে গুরুজির শিষ্যকেই বেছে নিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই। তবে তিনি আজীবন বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। গুরুজি বললেন, তুমি অবিবাহিত, সাধনা করতে গেলে তোমাকে সাধন সঙ্গী নিতে হবে মানে বিয়ে করতে হবে। লালনের তরিকা আর গুরুজির নির্দেশ ব্যতীত সব বিষয়ে দুই জন দুই ভুবনের বাসিন্দা। তবে তিনি বিয়ের পরে শুনতে পেরেছেন তার স্বামীও আজীবন অবিবাহিত থাকতে চেয়েছিলেন। আমার কাছে মনে হলো এটাও তাদের যুগল জীবনের বিপরীতে হিত উপলক্ষ্য, যা তাদের মিলনে সাদৃশ্যতা জুগিয়েছে।

দেশের ঘরে বিদেশি বউ। পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের মাঝে হয়ত তাদের নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। আমারও কৌতূহল হলো, জিজ্ঞেস করি– তাদের দাম্পত্য জীবনের কথা। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন যাচ্ছে আপনাদের দিনকাল। তিনি জানালেন, এই তো বেশ। সাঁইজির কৃপায় ভালোই আছি। আরো বললেন, কয়েক বছর ধরে তাদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক। কখনো তাদের দুজনের মধ্যে অমলিন কিংবা অশোভন আচরণ হয়নি। তবে মাঝে মাঝে মান-অভিমান বা কথা কাটাকাটি হয়েছে। এসময় দেবোরা রাজনকে অভিমানে বলত, 'আরেকটা বিয়ে করে (নিকেহ), অন্য একজন নারীকে নিয়ে নতুন করে সংসার শুরু করো গিয়ে। তখন বুঝবে সংসার জ্বালা কী? আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখব।'

এগুলো কথার কথা, আসলে সেরকম কিছু না। তাদের পরস্পরের বোঝাপড়া মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার কাছে খুব ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক মনে হলো। ওদের চার চোখে যে গভীর মায়া দেখলাম তা পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথেই তুল্য নয়। বাহ্যিকভাবে তাদের মধ্যে আমি অনেক অসমতাও লক্ষ করলাম। কিন্তু তাদের আত্মার বন্ধন যে খুবই শক্ত– এটা আমি খুব সহজেই বুঝতে পারলাম। তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের গল্প শুনে আমার খুবই ভালো লাগল।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম, তিনি যে পথ বেছে নিয়েছেন– এটা আসলে সহজ পথ না। যদিও এর নাম সহজ পথ। এটা কিছুটা জেনেশুনে বিষপান করার মতো। এই জীবন ধারায় তারা জীবিত থেকেও মরা। আর পরতে হয় জিন্দার দেহে মুর্দার বসন, একে বলা হয় জ্যান্তে মরা। তাই জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বর্তমান জ্যান্তে মরা জীবনযাপন ও সাধনা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? তিনি বললেন, গুরুজি নহির শাহর শিষ্য হিসেবে আমৃত্যু সাধুসঙ্গ নিয়ে লালনের দেশ কুষ্টিয়ার প্রাগপুরে থাকতে চান। তার মতে, দেহ কেবলমাত্র সবকিছু বয়, মরে গেলে লাশ মাত্র। 'আমি আমার লাশ বা দেহটি এই কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের প্রাগপুর আশ্রমে রেখে দেব। মাজার হবে এখানেই। আমি আর ফিরে যাবো না ফ্রান্সে।'

আলাপ শেষ না হতেই অ্যাম্বেসির ভেতর থেকে উনার ডাক পড়ল। ভেতরে উনাদের আরো কী জানি কাজ বাকি আছে। তাই আমাকে বিদায় জানিয়ে উনি আর রাজন অ্যাম্বেসির ভেতরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে খুব বিনম্রভাবে দুই হাত তুলে জয়গুরু বললেন। আমাকে কুষ্টিয়ায় তাদের আখড়ায় যাওয়ার জন্য বললেন। আমিও তাদের জন্য শুভকামনা জানালাম। আমার বাসায় আসার জন্য বললাম। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে কী যেন মনে করে দেবোরা আমার কাছে ফিরে এলো। শুধু দেবোরাই এসেছে, রাজন আসেনি। আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার। উনি বললেন, আপনার ফোন নম্বর নেওয়া হয়নি। এরপর আমরা মোবাইল ফোন নম্বর বিনিময় করে আজকের মতো চূড়ান্ত বিদায় নিলাম।

বিদায়কালে আমার কাছে মনে হলো, আমি দুজন বিশুদ্ধ মানুষকে বিদায় জানালাম। কিছুটা খারাপ লাগলেও আমি মনে মনে চাইলাম, আজীবন ভালো থাকুক দেবোরা-রাজন। ভালো থাকুক সাঁইজির দেখানো সহজ পথের দর্শন। যে পথ মানুষকে আত্মার শান্তি দেয়, সে পথ আরো বিস্তৃত হোক। সেই বিস্তৃত পথে, একতারা হাতে শত সহস্র দেবোরা আজীবন গাইবে–

ধন্য ধন্য বলি তারে,
বেঁধেছে এমন ঘর শূন্যের উপর পোস্তা করে

মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান: উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

বাবার জন্যে একগুচ্ছ কথামালা

মিয়াজান কবীর

বাবা হলেন সন্তানের বটবৃক্ষের ছায়া। একজন ছায়াসঙ্গী। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দিনে দিনে চন্দ্রকলার মতো বেড়ে ওঠে। ধুলোমাটিতে এক পা-দু পা করে বাবার শক্ত হাতটি ধরেই পথ চলতে শিখে। বাবার হাত ধরেই একটি শিশুর পথচলা শুরু হয়। বাবা হচ্ছেন সন্তানের পথ চলার সারথি। পথ চলতে শিশুটি কখনও মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে বাবাই তাকে পরম মমতায় টেনে তুলেন।

বাবা হলেন মাথার ছাতা। বিপদে-আপদে, ঝড়-বৃষ্টিতে বাবা তার শিশু সন্তানকে বুকে আঁকড়ে রাখেন। বাবা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে পরম মমতায় নিরাপদ আশ্রয় দেন তার আদরের সন্তানকে। বাবা হচ্ছেন মমতা আর নির্ভরতার এক উজ্জ্বল প্রতীক। বাবা সন্তানের সুখ-দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ান। মায়াবী বন্ধনে সন্তানকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে লালনপালন করেন।

বাবা রাতদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানকে তিলে তিলে গড়ে তোলেন। সন্তানের অসুখ হলে বাবা অস্থির হয়ে পড়েন। সুস্থতা কামনায় অধীর আগ্রহে বসে থাকেন শিয়রের পাশে। অসুস্থ সন্তানের মুখে তুলে দেন ওষুধ আর পথ্য। রোগ মুক্তির কামনায় পরম স্রষ্টার কাছে কায়মনোবাক্যে করেন প্রার্থনা।

সন্তানের জন্য বাবার স্নেহ-মমতা অপরিসীম। বাবা নিজে না খেয়ে সন্তানের মুখে তুলে দেন আহার। নিজে পুরানো কাপড় পরে সন্তানের জন্য নতুন জামাকাপড় কিনে দেন। শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও সন্তানের শখ-আহ্লাদ পূরণে বাবা সচেষ্ট থাকেন। বাবা তার কষ্টের কথা বুকে চেপে রাখেন। সন্তানকে তার কষ্টের কথা কখনো বুঝতে দেন না।

বাবা সংসার পরিচালনার এক চাবিকাঠি। সংসার পরিচালনার জন্য বাড়ির বাইরে গিয়ে বাবাকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়। আবার অনেকেই নিজের সন্তানসন্ততির সুখের কথা চিন্তা করে দেশের মায়া ছেড়ে আপনজনের কাছ থেকে চলে যান দূর প্রবাসে। বাবা যত দূরেই থাকুক না কেন তার মন পড়ে থাকে

সন্তানের কাছে। সন্তানের দিকে তার সদা দৃষ্টি থাকে। প্রত্যেক বাবাই তার সন্তানের মঙ্গল কামনায় অধীর থাকেন। বাবা দেখতে চান সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল সাফল্য।

কাল নিরবধি। কালের ভেলায় ভেসে ভেসে সময় বয়ে যায়। আজকের ভূমিষ্ঠ নবজাতক শিশুটি কালের পরিক্রমায় বড়ো হতে থাকে। পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মে এক সময় শিশুটি বাবা হয়ে ওঠে। সে তখন বুঝতে পারে বাবা হওয়ার স্বাদ। তখন তার মনে পড়ে ফেলে আসা শৈশবের স্বপ্নঝরা স্মৃতি। এক এক করে মেলাতে থাকে তার নিজের ছেলেবেলার স্মৃতিপটে আঁকা দিনগুলোর কথা। তখন সে বুঝতে পারে একজন বাবা হতে হলে কতটুকু নিঃস্বার্থবান হতে হয়। কতটুকু দায়িত্ব পালনের ভেতর দিয়ে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এ কথা মনে করেই একজন সন্তান তার বাবার প্রতি অবিচল ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। সেই জন্মদাতা বাবার ভালোবাসা মনে রেখেই প্রতিবছর সারাবিশ্বে পালিত হচ্ছে বাবা দিবস। বাবা দিবস উদ্‌যাপনের রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

ইতিহাসের আলোকে জানা যায়, সনোরা স্মার্ট ডড নামে একজন মেয়ে খুব অল্প বয়সে তার মাকে হারান। প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়ে স্মার্ট ডডের বাবা খুব কষ্ট করে সন্তানদের লালনপালন করেন। বাবার প্রতি সম্মান প্রকাশ করতেই স্মার্ট ডড ও তার ভাইবোনেরা মিলে বাবা দিবস পালনের চিন্তা করেন। এরপর তারা প্রশাসন ও গির্জার যাজকের শরণাপন্ন হন। ৫ই জুন তার বাবার জন্মদিনেই বাবা দিবস উদ্‌যাপন করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন স্মার্ট ডড। কিন্তু সংগত কোনো এক কারণে স্মার্ট ডড ও তার ভাইবোনেরা ১৯১০ সালের জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বাবা দিবস পালন করেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, স্মার্ট ডডের আগেই ১৯০৮ সালের ৫ই জুলাই আমেরিকার ভার্জিনিয়া ফেয়ারমন্টের এক গির্জায় বাবা দিবস পালন করা হয়। স্মার্ট ডড এ কথা জানতেন না। তবে স্মার্ট ডড নিরলসভাবে বাবা দিবসকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালনের লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯১৩ সালে মার্কিন সংসদে বাবা দিবসকে ছুটির দিন ঘোষণা করার লক্ষ্যে একটি বিল উত্থাপন করা হয়।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে ১৯৬৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন বাবা দিবসকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। মার্কিন কংগ্রেস ১৯৭০ সালে সরকারিভাবে প্রতিবছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বাবা দিবস পালনের জন্য নির্দেশ জারি করে। ১৯৭২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন সরকারি সব দপ্তরে পতাকা উড়িয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাবা দিবস উদ্‌যাপন করেন।

বাবা দিবস শুধু আনুষ্ঠানিকতার বিষয় নয়। বাবা সন্তানের একজন অভিভাবক, একজন শিক্ষক, চলার পথে একজন সারথি। একটি লোকগানে ফুটে উঠেছে বাবার স্বমহিমা– 'মাতা গুরু, পিতা গুরু, গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই, তাহার চাইতে অধিক গুরু ভজিলে সে পায়।'

বাবাকে কোনো বিশেষণে বিশেষায়িত করার নয়। বাবার কোনো তুলনা নেই। বাবার তুলনা শুধু বাবা নিজেই। কাজেই বাবা দিবস হোক প্রতিদিন। বাবা বেঁচে থাকুক প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধায়, মমতায় আর ভালোবাসায় সন্তানের অন্তরের অন্তস্তলে।

মিয়াজান কবীর: লেখক ও গবেষক, miajankabir@gmail.com

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য ৩ লাখ কোটি টাকার এডিপি অনুমোদন দিয়েছে এনইসি

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) ১৮ই মে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা, অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য ৩ লাখ কোটি টাকার একটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুমোদন দিয়েছে। ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য নতুন এই এডিপি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক আধুনিকীকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সংস্কারমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। এনইসি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত নতুন সরকারের অধীনে প্রথম এনইসি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠক শেষে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আবদুর রহিম সাকি এবং পরিকল্পনা সচিব এস এম শাকিল আখতার উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সচিবরা অংশ নেন।

প্রতিবেদন: দিপা মোনালিসা

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

ডা. প্রিয়াংকা বিশ্বাস

জীবনের জন্য প্রয়োজন রক্ত। রক্তের বিকল্প শুধু রক্ত। অপারেশনের জন্য, হিমোফেলিয়া, থ্যালাসেমিয়া বা দুর্ঘটনার কারণে রক্তক্ষরণ হলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন প্রয়োজন হয়। শুধু রক্ত হলেই হবে না, জীবনের জন্য চাই বিশুদ্ধ রক্ত। রক্ত দিন, জীবন বাঁচান। রক্ত দিতে আপনার সদিচ্ছাই যথেষ্ট। আপনার দেওয়া এক ব্যাগ রক্ত ফিরিয়ে দিতে পারে একজন মুমূর্ষু রোগীর জীবন। বিশ্ব রক্তদাতা দিবস প্রতিবছর ১৪ই জুন পালিত হয়। এই দিবসটি প্রথম ২০০৪ সালে উদ্‌যাপিত হয়। এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক স্বীকৃত বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচিগুলোর একটি। এই দিবসের উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ রক্ত ও রক্তজাত পণ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানকারী ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থ অবদানের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যেহেতু রক্ত কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় না, তাই জরুরি পরিস্থিতি, জটিল চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার, প্রসবকালীন জটিলতা এবং থ্যালাসেমিয়ার মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসায় স্বেচ্ছায় রক্তদাতারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে মৃত্যুহার ও অক্ষমতার হার কমে এবং মানুষের জীবনমান উন্নত হয়।

চিকিৎসাগত গুরুত্বের পাশাপাশি এক ব্যাগ রক্তদান মানবতা, সহমর্মিতা, সংহতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক। তাই বিশ্ব রক্তদাতা দিবস ২০২৬-এর প্রতিপাদ্য হলো: 'মানবতার এক ফোঁটা। রক্ত দিন। জীবন বাঁচান।' (One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.)

নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন

নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন বলতে বোঝায়:

১. দাতা ও গ্রহীতার রক্তের সঠিক মিল নিশ্চিত করা এবং ভুল রক্তের কারণে কোনো প্রতিক্রিয়া না হওয়া।

২. দাতার কাছ থেকে গ্রহীতার শরীরে কোনো রোগ সংক্রমিত না হওয়া।

WHO অনুযায়ী রক্তদাতার মৌলিক যোগ্যতা

- বয়স: ১৮-৬৫ বছর
- ওজন: কমপক্ষে ৫০ কেজি
- স্বাস্থ্য: সুস্থ থাকতে হবে এবং রক্তদানের দিন ভালো অনুভব করতে হবে

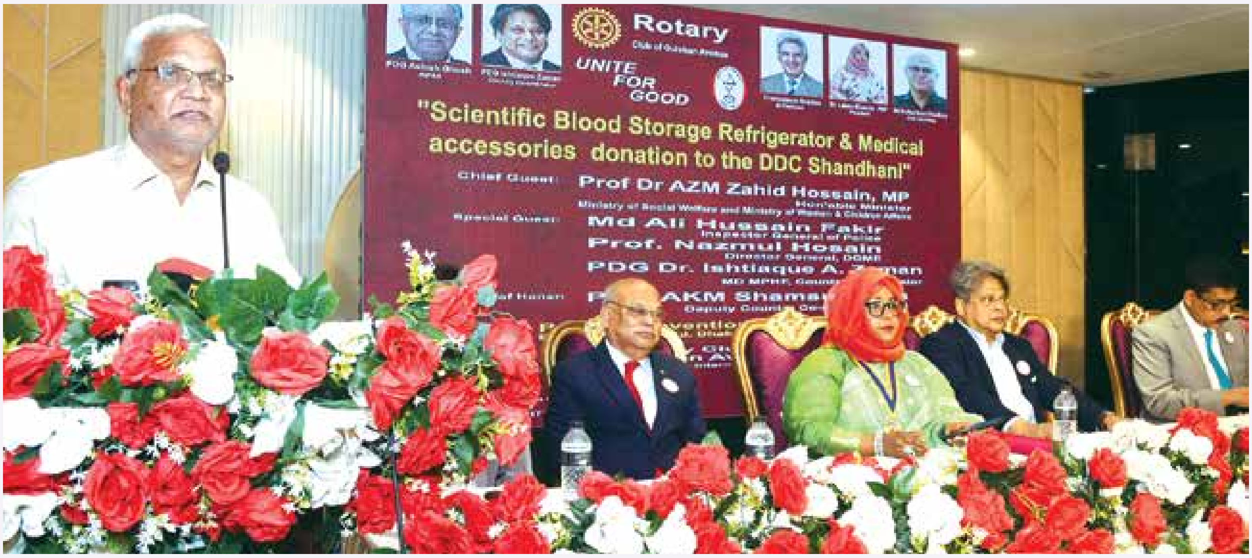

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী ডা. এ জেডএম জাহিদ হোসেন ৬ই জুন ২০২৬ ঢাকায় ইস্কাটন গার্ডেনে পুলিশ কনভেনশন হলে আয়োজিত ডিডিসি সন্ধানীকে বৈজ্ঞানিক রক্ত সংরক্ষণের রেফ্রিজারেটর এবং চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

- শরীরের তাপমাত্রা, রক্তচাপ ও নাড়ির গতি: স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকতে হবে
- হিমোগ্লোবিনের মাত্রা: নারী $\geq$ ১২ গ্রাম/ডেসিলিটার, পুরুষ $\geq$ ১৩ গ্রাম/ডেসিলিটার
- রক্তদানের ব্যবধান: প্রতি ৩-৪ মাস অন্তর পূর্ণ রক্তদান করা যায়

সাময়িকভাবে রক্তদান স্থগিত রাখার কারণ

- সর্দি, ফ্লু, জ্বর বা সক্রিয় সংক্রমণ থাকলে
- নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ সেবন করলে
- গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালীন সময়ে
- সাম্প্রতিক অস্ত্রোপচার, রক্ত সঞ্চালন বা কিছু নির্দিষ্ট টিকা
- গত ৬ মাসের মধ্যে ট্যাটু বা শরীরে পিয়ার্সিং করালে
- ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক রোগপ্রবণ এলাকায় ভ্রমণ করলে

স্থায়ীভাবে অযোগ্য (যারা রক্ত দিতে পারবেন না)

- HIV/AIDS, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি বা সিফিলিসের ইতিহাস থাকলে
- গুরুতর হৃদরোগ, লিভারের রোগ বা কিডনির রোগ থাকলে
- নির্দিষ্ট ধরনের ক্যানসার ও রক্তজনিত রোগ থাকলে
- শিরার মাধ্যমে মাদক গ্রহণের ইতিহাস এবং একাধিক যৌন সঙ্গীর ইতিহাস থাকলে

বাংলাদেশে জাতীয় নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন নীতিমালার আওতায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই রক্ত সঞ্চালন সেবা প্রদান করা হয়। দেশে বছরে আনুমানিক ৮,০০,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। ন্যাশনাল সেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন প্রোগ্রাম (NSBTP)-এর তথ্য অনুযায়ী, মোট সংগৃহীত রক্তের মাত্র ৩০% আসে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের কাছ থেকে এবং বাকি ৭০% আসে পরিবারের সদস্য বা বিকল্প (Replacement) দাতাদের কাছ থেকে, যা জাতীয় চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। WHO-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ১০০% স্বেচ্ছায় রক্তদানভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে, যাতে পর্যাপ্ত রক্তের সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় এবং নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা যায়।

স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ পূরণ করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, সন্ধানী, রেড ক্রিসেন্টসহ বেসরকারি সংস্থা। স্বেচ্ছা রক্তদাতারা হলেন মানুষের জীবন বাঁচানো আন্দোলনের দূত। প্রয়োজন সচেতন তরুণসমাজকে এগিয়ে আসা। কারণ স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমে যে-কোনো সুস্থ মানুষ নিজের কোনো ক্ষতি না করেই একজন মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচাতে পারে। ভালো কাজে মানুষ সবসময় অন্যকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়। বন্ধু রক্ত দিচ্ছে দেখে তার আরও বন্ধুও রক্ত দিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

রক্তদান একটি মানবিক দায়বদ্ধতা, সামাজিক অঙ্গীকার। এক ব্যাগ রক্তদানও সামাজিক অঙ্গীকার। রক্ত দেওয়া নিয়ে অনেকের মনে ভীতি ও ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকেই ভাবেন রক্ত দিলে বোধ হয় শরীর খারাপ হয়। এটি ভ্রান্ত ধারণা। আসলে রক্ত দিলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। শরীর শুকিয়ে যায় না বা শক্তিও নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং রক্তদানের বিভিন্ন উপকার আছে। রক্তদাতার হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও অনেক কমে। রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। নিয়মিত স্বেচ্ছা রক্তদাতারা দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধি থেকে প্রায়ই মুক্ত থাকেন। আসুন আমরা মানবিক হই। রক্ত দিন, জীবন বাঁচান– স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসি। আমাদের রক্ত হাসি ফোটাতে পারে একজন মায়ের, একজন বাবার, একজন স্ত্রীর, একজন সন্তানের, সর্বোপরি একজন মুমূর্ষু রোগীর। স্বেচ্ছায় রক্তদান করি, মানুষের জীবন বাঁচাই।

ডা. প্রিয়াংকা বিশ্বাস: মেডিক্যাল কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স অ্যান্ড হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, preyankabiswas39@gmail.com

নরকের সিঁড়ি থেকে স্বর্গের সিঁড়ি

মো. বেলায়েত হোসেন

খাগড়াছড়ি জেলা শহর থেকে আনুমানিক ৮-১০ কিলোমিটারের মধ্যে স্বর্গের সিঁড়ি। তবুও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে দুর্গম এলাকা বললে ভুল হবে না। খাগড়াছড়ি জেলা শহর থেকে পানছড়ি যাওয়ার পথে পেরাছড়া ইউনিয়নের জামতলী নামক স্থানে চেঙ্গী নদী পার হয়ে যেতে হয়। বর্ষায় নৌকায় আর শুকনো মৌসুমে বাঁশের সাঁকো দিয়ে চেঙ্গী নদী পার হয়ে আরও প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটতে হয়। তবে হাঁটার জন্য কোনো মসৃণ রাস্তা নেই। কোথাও পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, কোথাও ছড়া-ঝিরি পেরিয়ে আবার কোথাও পাড়ি দিতে হয় পাহাড়। পর্যটকদের জন্য রোমাঞ্চকর ট্র্যাকিং হলেও ঐ এলাকার বাসিন্দাদের জন্য নিয়তির ভোগান্তি। স্পটটি ভ্রমণ করার প্রবল ইচ্ছে। দুর্গম এলাকা এবং বাস্তব পরিস্থিতির কারণে চাইলেও এখানে যে-কোনো সময় কিংবা একাকী যাওয়া সম্ভব নয়। শহরকেন্দ্রিক পর্যটন স্পট ব্যতীত তিন পার্বত্য জেলার প্রায় প্রতিটি পর্যটন স্পটেই একই সমস্যা।

গাড়ি যোগে জামতলী পর্যন্ত গিয়ে বাঁশের সাঁকোতে চেঙ্গী নদী পার হয়ে আঁকাবাঁকা পথে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল কৃষিজমি। ধান নিড়ানি দিচ্ছেন এলাকার নারীরা। পাহাড়ে কৃষিকাজ কিংবা জুমচাষে পুরুষ-নারীর মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। পাহাড়ি বাজারগুলোতে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই তুলনামূলকভাবে বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যাপিত জীবনের স্রোতে পুরুষের চেয়ে বিভিন্ন কাজে নারীরা এগিয়ে। চাষাবাদের পানি চেঙ্গী নদী থেকে মটর দিয়ে তুলতে হয়। চেঙ্গী নদী পার হয়ে একটি দোকানের সামনে পেয়ে গেলাম একটি ছেলেকে। নাম লিটন চাকমা। সে গাইড হিসেবে আমাদের সাত জনের টিমের সঙ্গী হলো। সামনে চোখে পড়ল রশি দিয়ে বাঁধা দুটি শুকর। এ জনপদের মানুষের শুকর পালন ঐতিহ্যবাহী পেশা। কথা বলে জানা যায়, এ মাংসের চাহিদা এখনো অক্ষুণ্ন থাকলেও সময়ের সাথে লালনপালনের হার কমে এসেছে।

কিছু দূর যেতেই একটি ছোটো ছড়া (পাহাড়ের উৎস থেকে নির্গত এক প্রকার ছোটো জলধারা) সামনে পড়ল। কোনো সমস্যা ছাড়াই পাড়ি দিয়ে ওপাড়ে গেলাম। ছড়াগুলোও প্রায় শুকিয়ে গেছে। পাশেই একটি মাটির ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। মাটির ঘর ঐতিহ্যবাহী। ঐহিহ্যের চেয়ে বেশি হচ্ছে দারিদ্র্যের কষাঘাত। হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য ছড়ায় বাঁধ দিয়ে পানি জমিয়ে রেখেছে। আবার কেউ ছড়ার এ পানি ব্যবহার করছে চাষাবাদে। এ ছড়া-ঝিরি যাদের বসতঘর থেকে দূরে তাদের ক্ষেত্রে পানির কষ্ট অকল্পনীয়। সবচেয়ে বেশি কষ্ট ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। অনিরাপদ পানি খেয়ে দেখা দেয় নানা পানিবাহিত রোগ। বৃষ্টি পর্যন্ত এভাবেই তাদের চলতে হয়। অপেক্ষা করতে হবে এপ্রিলের আশীর্বাদপুষ্ট বৃষ্টির জন্য।

অনেক উঁচু একটি পাহাড় পাড়ি দিতেই দেখা যায় বনে আগুন লাগানোর দৃশ্য। সনাতন পদ্ধতিতে জুমচাষে এখনো শীতকালে প্রায় সকল পাহাড়ে কৃষকরা আগুন লাগিয়ে পরিষ্কার করে। পাশাপাশি ছাই মাটিতে মিশে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। তবে উপকারের পাশাপাশি ক্ষতিও কম নয়। আগুনের কারণে বন্যপ্রাণীরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে। পোকামাকড় মারা যায়। এতে বন্যপ্রাণীর জীবন হুমকির মুখে পড়ে। ধ্বংস হয় জীববৈচিত্র্য। উঁচুতে হাঁটায় বেশ ক্লান্ত। সামনে বড়ো একটি বটগাছের দেখা মিলল। গাছের নিচে সবাই বসলাম। পাশে একটি চায়ের দোকানও আছে। বটগাছের নিচে কেরাম বোর্ড খেলছে কয়েকজন যুবক। জিজ্ঞাসা করতে জানা যায়, স্থানটির নাম কাপতলা (এটি ত্রিপুরা ভাষার শব্দ; কাপ মানে সিঁড়ি)। ছোটো-বড়ো কয়েকটি পাহাড়ের সুউচ্চ সিঁড়ি পেরিয়ে আসতে হয় এখানে। তবে সে জন্য এমন নাম কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রথমবারের মতো এ পথে আসা। আমার কাছে অচেনা-অজানা পথ। তাই হয়ত দুর্গম বলে মনে হয়। ভৌগোলিক অবস্থান, গঠনসহ অন্যান্য আরও অনেক কারণে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ দুর্গম এ জনপদে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

উঁচু পাহাড় পাড়ি দিতে যখন হাঁপিয়ে উঠছিলাম, ঠিক তখনই পেছন থেকে কয়েকজন আমাদের পাড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলেন অনায়াসে। কারো কাঁধে কলার ছড়ি আবার কারো কাঁধে রান্নার লাকড়ি। কথা বলে জানা যায়, তারা কলা কেটে বাগান থেকে ফিরছেন। শ্রমিক ও বাগানী। কাঁধে তুলে বাজারে কলা নিয়ে পৌঁছাতে ৩-৪ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। খরচও বেশি। তাই পাইকার এসে বাগান থেকেই কলা নিয়ে যায়। এতে বেশি লাভ পাওয়া যায়। প্রতি ছড়ি কলার মূল্য কমবেশি চারশো টাকা। ঘড়িতে তখন বেলা বারোটার কাছাকাছি। দুপুরের খাবার খেয়ে আবারও যাবেন বাগানে। জানা যায়, আশপাশে কোথাও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই। অসুস্থ রোগীকে বাঁশের দোলনায় কিংবা কম্বল-কাঁথা পেচিয়ে কাঁধে তুলে সদর হাসপাতালে নিতে হয় চেঙ্গী নদী পাড়ি দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে কথা হয় যাপিত জীবনের নানান ব্যঞ্জনা নিয়ে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কষ্টের কথাগুলো বলেন। এমন জীবনে অভ্যস্ত, হয়ত তাই।

এখানে যোগাযোগের জন্য রাস্তার শুধু সমস্যা তা নয়, বিদ্যুৎ সুবিধা নেই। সচরাচর নেই আধুনিক প্রযুক্তির সকল কোম্পানির ইন্টারনেট সুবিধা। সুপেয় পানির বিষয়টি অনেকেই বোঝেন না। খাবার এবং অন্যান্য সকল কাজের ব্যবহারে ছড়ার পানিই একমাত্র ভরসা। তবে পথে পাহাড়ের তলদেশে দুটি কূপ। কাছে গিয়ে দেখলাম পাহাড় থেকে ঘেমে ঘেমে পানি কূপ দুটিতে জমা হচ্ছে। আর পাড়ার মানুষ এ পানি কলসি দিয়ে নিয়ে যায় খাবার আর রান্নাবান্নার জন্য। এখানে এসেই গোসল করছে। এখনো শুষ্ক মৌসুমে এ ব্যবস্থাই পাহাড়ি জনপদের অধিকাংশ মানুষের পানি চাহিদা মেটানোর অন্যতম পদ্ধতি।

কাপতলায় কিছুক্ষণ বসে সঙ্গে নেওয়া নাস্তা-পানি খেয়ে ক্লান্তিভাব দূর করে আবারও হাঁটতে শুরু করলাম। ১০-১৫ মিনিট হাঁটতেই চলে আসলাম স্বর্গের সিঁড়ির পাদদেশে। স্বর্গের সিঁড়ি এলাকাটির স্থানীয় নাম 'মায়ুং কপাল'। এটি ত্রিপুরা ভাষার শব্দ; যার অর্থ 'হাতির মাথা' (মায়ুং মানে হাতি, আর কপাল মানে মাথা)। এটি মূলত ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা। দূর থেকে পাখির চোখে বা ড্রোন ক্যামেরায় এর অবয়ব অনেকটা হাতির মাথার মতো বলেই এমন নামকরণ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় বারোশো ফুট উচ্চতায় এর অবস্থান। সিঁড়ির নিচে একটি নামফলকে উদ্বোধনের তারিখ ১৩ই জুন ২০১৫ লেখা। প্রায় তিনশো ধাপের এ সিঁড়ি পাড়ি দিয়ে উপরে উঠতে কিছুটা ভয়ও মনে ভর করছে। তবুও আশপাশের কোনো দিকে না তাকিয়ে উপরে উঠে গেলাম। আমাদের টিমের দুজন কয়েক ধাপ উঠে আবার নিচে নেমে আসলেন। তাদের সাহসের কাছে ইচ্ছার পরাজয় ঘটেছে।

উপরে এসে যত দূর চোখ যায় শুধু বন আর বন। সকল স্থাপনাকে অনেক ক্ষুদ্র মনে হয়। পুরো খাগড়াছড়ি শহর খুবই ছোটো। মনে হতে পারে সবুজ স্বর্গ। কোনো লোকজন নেই। শুধু দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে বসেছিল। দেখে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী মনে হলো। আমাদের দেখে তারা কিছুটা সংকোচ করে উঠে গেল। সিঁড়ি শেষেও আরও উপরে যাওয়া যায়। তবে তা উঁচু হলেও হেঁটে যাওয়ার মতো। চলে গেলাম পাহাড়ের সর্বোচ্চ জায়গায়। এ পাহাড় থেকে আরও দূরে অনেকগুলো পাড়া আছে, যেখানে অনেক পরিবারের বসতি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, এ পথ পেরিয়ে যেতে হয় সে সব পাড়ায়। এ সিঁড়ি মূলত দুর্গম পাড়াগুলোর যাতায়াতের জন্য তৈরি হলেও বর্তমানে পর্যটকরা সিঁড়ি ও এলাকার নান্দনিকতা দেখতে আসেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে আসার পথে দেখা মধ্যবয়সি এক যুবকের সাথে। নাম হৃদয় ত্রিপুরা। থাকেন বাংগামুড়া পাড়ায়। জুমচাষেই চলে জীবন-জীবিকা। কাঁধে বাঁশ দিয়ে ঝুলানো পাল্লায় মালামাল নিয়ে ফিরছেন বাজার থেকে। যেতে একবার এবং আসতে একবার পাড়ি দিয়েছেন ৩০০ ধাপের এ সিঁড়ি। নিজ বাগানের ছোটো ছোটো সাত ছড়ি কলা নিয়ে বাজারে গেছে। সকাল সাড়ে ছয়টায় রওয়ানা দিয়ে দশটায় দোকানে পৌঁছে। পনেরোশো টাকায় বিক্রি করেছে। নিয়ে এসেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার-সদাই। সাড়ে তিন ঘণ্টা পথ হেঁটে বাজারে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ শেষে আবার হেঁটেই ফিরছেন। এতে প্রায় পুরো দিন ব্যয় হয়। আমাদের কাছে অবাস্তব মনে হলেও এটিই তাদের বাস্তবতা। শুকনো সময়ে এত বড়ো উঁচুনিচু পাহাড় পাড়ি দিতে পারলেও বিপত্তি ঘটে বর্ষায়। পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে ঘটে অনেক দুর্ঘটনা। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করতেই জানা যায়, 'প্রাইমারি স্কুল' আশপাশে নেই। অনেক দূরে। আবার কেউ প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হলেও সামর্থ্য না থাকায় বন্ধ করে দিতে হয় পড়াশোনা। মাধ্যমিক বিদ্যালয় খাগড়াছড়িতে। বাসা ভাড়া করে বা হোস্টেলে থাকতে হয়। তাই যাদের খরচ চালানোর টাকাপয়সা আছে বা সামর্থ্য আছে তারা পড়াশোনার সুযোগ পায়। নিজের ছেলেমেয়ে দুজন। একজন ছেলে একজন মেয়ে। বড়ো জন চতুর্থ শ্রেণিতে। পানছড়ির লোগাংয়ে নানুর বাড়িতে পড়াশোনা করে। ছোটো ছোটো কুয়া তৈরি করেছেন ঘরের পাশে। ছড়ার পানি কুয়ায় সংরক্ষণ করে তা থেকে ব্যবহার করেন। এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। ইলেকশন এলে প্রার্থীদের কাছে রাস্তাঘাট, খাবার পানির সুবিধা চায় পাড়ার মানুষ। তারাও করার প্রতিশ্রুতি দেন। ইলেকশন শেষে কিছুই করেন না।

এ সিঁড়ি করার পূর্বে পাহাড়ের এ পাড়ে বসবাসকারী মানুষের যাতায়াত ছিল অবর্ণনীয় কষ্টের। তখন এটি ছিল নরকের সিঁড়ি। বর্ষায় যাতায়াতে পিচ্ছিল কর্দমাক্ত সিঁড়ি পার হতে ঘটেছে অনেক দুর্ঘটনা। কথা হয় আরও একজনের সঙ্গে। নাম ধনেশ্বর ত্রিপুরা। এ সিঁড়ি তৈরির পূর্বে প্রথম পর্যায়ে পাহাড়ে ছোটো ছোটো ধাপ তৈরি করে চলাচল করত। বর্ষায় পিচ্ছিল কিংবা অধিক বৃষ্টিতে ধাপগুলো ভেঙে ঘটত দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় হারাতে হয়েছে অনেকের জীবন। পরবর্তীতে তুলা গাছ ও বাঁশ অল্প করে কেটে তার ধাপে ধাপে পাড়ি দিতে হতো এক হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু এ পাহাড়। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবন নিয়ে নেই কোনো অভিযোগ। এ জনপদের মানুষ থাকতে চায় নিজেদের মতো করে নিভৃতে।

মো. বেলায়েত হোসেন: কবি ও প্রাবন্ধিক, খাগড়াছড়ি,
belayethussain42@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন সম্পাদক পরিষদের নেতারা

বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জনপ্রশাসন সভাকক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন সম্পাদক পরিষদের নেতারা।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে ১৭ই মে ২০২৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জনপ্রশাসন সভাকক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং এ কথা জানায়। বৈঠকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর তথ্যবিষয়ক উপদেষ্টা ডা.জাহেদ উর রহমান, সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও *নিউএজ* সম্পাদক নুরুল কবির, সাধারণ সম্পাদক *বণিক বার্তা* সম্পাদক দেওয়ান হানিফ, *দ্য ডেইলি স্টার* সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম, *মানবজমিন* সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান, *দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস* সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, *দৈনিক ইনকিলাব* সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দিন, *সুপ্রভাত বাংলাদেশ* সম্পাদক রুশো মাহমুদ এবং *দৈনিক করতোয়া* সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের নিয়ে মধ্যাহ্নভোজ করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী ও অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী

শিশুশ্রম নিরসনে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা

শারমিন ইসলাম

আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুরাই আগামীর দেশ ও জাতি গড়ার কারিগর। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ শিশু। কিন্তু শ্রমের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে শিশুদের দুরন্ত শৈশব এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অন্ধকারের অতলে হারিয়ে যায়। শিশুশ্রম নিরসন বিশ্বব্যাপী আলোচিত বিষয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে শিশুশ্রম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– 'যখন কোনো শ্রম বা কর্মপরিবেশ শিশুর দৈহিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা শিশুশ্রম হিসেবে গণ্য হবে।' ইউনিসেফ শিশুশ্রম সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে– 'যে ধরনের কাজ শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে ব্যাহত করে তাই শিশুশ্রম।' এছাড়া আরও বলা হয়েছে, শিশুশ্রম এমন একটি কাজ, যা শৈশব কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত করে, শোষণ এবং অপব্যবহার করে, শিশুর শারীরিক, মানসিক বা উন্নয়নমূলক স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার ক্ষতি করতে পারে। ইউনিসেফ ছাড়াও দেশীয় বিভিন্ন সংস্থা সমাজের এই সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাদের লক্ষ্য হাতুরি নয়, শিশুদের হাতে থাকুক কলম, খাতা। ১২ই জুন 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস'। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে একজোটে কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এই দিবসটি পালিত হয়। ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' অনুমোদিত হয়। ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) শিশুশ্রম বন্ধ করতে এক কর্মসূচি হাতে নেয় এবং ২০০২ সালের ১২ই জুন থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবছর দিবসটি 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ দিবসটি পালন করছে। এই দিনটি সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক এবং নিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে একত্রিত করে শিশুশ্রমের সমস্যা চিহ্নিত করে এবং শিশুশ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য নির্দেশিকা নির্ধারণ করে।

একটি উন্নত জাতি গঠনে শিশুশ্রম নিরসনের কোনো বিকল্প নেই। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শিশুশ্রম একটি ভয়াবহ সমস্যা। যে বয়সে একটি শিশু বই হাতে নিয়ে বিদ্যালয়ে দুরন্ত শৈশব অতিবাহিত করার কথা, সে বয়সে তাকে ইটভাটা বা শিল্প-কারখানায় মানবেতর শ্রম দিতে হচ্ছে। সব ক্ষেত্রে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও ঘর থেকে বের হলে দেখতে পাওয়া যায় শিশুশ্রমের করুণ চিত্র। হোটেল, মোটেল, লঞ্চ, বাস, ইটভাটা, পাথরভাঙা, মোটর গ্যারেজ, অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, কলকারখানা, বাসাবাড়ি, মিষ্টি ও বিস্কুট ফ্যাক্টরি, তামাকশিল্প, চামড়াশিল্প, চা শিল্প, ভারীশিল্প ইত্যাদিতে প্রতিনিয়ত দেখা যায় শিশুশ্রমের নির্মম চিত্র। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রমের প্রথম ও প্রধান কারণ হলো 'অর্থনৈতিক দুরবস্থা'। পেটের ক্ষুধা নিবারণে এমনকি পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে অনেক শিশুরাই ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিযুক্ত হয়। খাবার জোগার করতে গিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে না অনেক শিশুই। আইএলও ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক প্রচেষ্টার ফলে শিশুশ্রম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০২৪ সালে বিশ্বে প্রায় ১৩ কোটি ৮০ লাখ শিশুশ্রমে যুক্ত ছিল, যার মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লাখ শিশুই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। এ কারণে তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৩ সালে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের হার ছিল ৩ দশমিক ২ শতাংশ, ২০২২ সালে তা কমে ২ দশমিক ৭ শতাংশ (প্রায় ১০ লাখ ৭০ হাজার শিশু) হয়েছে। তবে একই সময়ে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে শ্রমে যুক্ত থাকার সামগ্রিক হার ৮ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে। ক্ষতিকর কাজে যুক্ত শিশুশ্রমের হারও ৪ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। ইউনিসেফ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছে,

পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, গত দুই দশকে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ায় বাংলাদেশের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

শিশুর বয়সসীমা ও শিশুশ্রম নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে চিলড্রেন অ্যাক্টে শিশুর বয়স ১৬ বছর করা হয়। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে মতামত রাখা হয়েছিল ১৮ বছর হবে শিশুর সর্বোচ্চ সময়কাল। ১৯৯৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিশুনীতিতে শিশুদের বয়স ১৪ বছর করা হয়েছিল। ২০০৩ সালের ১লা জুন শিশুর বয়সসীমা ১৬ বছর নির্ধারণ করা হয়। ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রমআইন ২(৬৩) ধারায় 'শিশু' অর্থ ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো ব্যক্তি। ২০১১ সালে জাতীয় শিশুনীতি ২-১ ধারায় শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সি কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ বলা হয়েছে ১৪ বছরের কম বয়সিদের কাজে নিয়োগ করা যাবে না। শিশুর অভিভাবক কাজ করানোর জন্য কারো সঙ্গে কোনো প্রকার চুক্তি করতে পারবেন না। তারপরও রোধ করা যাচ্ছে না শিশুশ্রম। তবে শুধু আমাদের দেশেই নয়, শিশুশ্রমের চিত্র দেখা যায় বিশ্বের অনেক দেশেই। অশিক্ষা, অনিশ্চয়তা আর অসচেতনতাও এর জন্য দায়ী অনেকাংশে।

আইএলও-এর তথ্য অনুসারে, সারাবিশ্বে লক্ষ লক্ষ মেয়ে এবং ছেলে এমন কাজে জড়িত যা তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবসর এবং মৌলিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে, এভাবে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। এই শিশুদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি শিশুশ্রমের নিকৃষ্ট রূপের মুখোমুখি হয়। শিশুশ্রমের এই নিকৃষ্ট রূপগুলোর মধ্যে রয়েছে বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ, দাসত্ব বা অন্য ধরনের জোরপূর্বক শ্রম, মাদক পাচার এবং পতিতাবৃত্তির মতো অবৈধ কার্যকলাপ, পাশাপাশি সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়াও রয়েছে।

বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে দীর্ঘদিন ধরেই শিশুশ্রম বাংলাদেশে বিরাজমান। দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এটি দৃষ্টিকটু। শিশুশ্রমকে কেন্দ্র করে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে সরকার। বর্তমানে গার্মেন্টস সেক্টর শিশুশ্রমমুক্ত। এরপরও গোটা দেশে শিশুশ্রম সন্দেহাতীতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম দ্রুত নিরসন সম্ভব না হলেও সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে কমিয়ে আনা সম্ভব। ২০১৩ সালের আগে বাংলাদেশে কায়িক শ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিশুর সংখ্যা ছিল ৩৪ লাখ। বর্তমানে বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে সেই সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিশুশ্রম নিরসনে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন সুপারিশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে:

১. শিশুশ্রমকে বলা হয় দারিদ্র্যের ফসল। তাই শিশুশ্রম বন্ধ করতে হলে প্রথমেই দারিদ্র্যতাকে নিরসন করতে হবে।

২. অমানবিক শিশুশ্রম বন্ধে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে, অন্যের শিশুকে নিজের সন্তানের মতো মনে করতে হবে।

৩. প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৪ বছরের কম বয়সি শিশুদের সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করতে হবে।

৪. শিশুশ্রম বন্ধে গ্রাম ও শহরভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৫. অভাবের কারণে যেসব শিশুরা শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের শিশুভাতা দিতে হবে।

৬. শিশুশ্রম নিরসনে যেসব আইন রয়েছে তা বাস্তবায়ন এবং স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। সবার সমন্বিত উদ্যোগে শিশুশ্রম নিরসন সম্ভব।

৭. কোথায় কোথায় শিশুশ্রম হচ্ছে তা খুঁজে বের করা দরকার এবং গণমাধ্যমে এ বিষয়ে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে।

৮. অনেক মালিক আছে যারা বেশি বেতন দিতে হবে এজন্য বড়োদের কাজে রাখে না, শিশুদের দিয়ে কাজ করায়। এসব মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকৌশলে শিশুশ্রম নিরসনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দিতে হবে।

১০. শ্রমজীবী প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. শিশুশ্রম এবং শিশুদের অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শিশুশ্রম নিরসনে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে।

শিশুরাই দেশ ও জাতির কর্ণধার। তারাই আগামীর রাষ্ট্র পরিচালনার সুমহান দায়িত্ব হাতে নেবে। এজন্য শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও মেধার বিকাশের জন্য নানা ধরনের পরিচর্যা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে শিশুরা অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের কারণে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। আশার কথা হলো, সম্প্রতি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুকে শিশুশ্রম থেকে প্রত্যাহারে ছয় মাসের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং চার মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ শিশুরা প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে উপবৃত্তি পাবে। উপবৃত্তির এ অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশের মাধ্যমে দেওয়া হবে। এক লাখ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে প্রত্যাহার করা হবে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে শুধু এই এক লাখ শিশুকে প্রত্যাহারই নয়, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার করা হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে শিশুশ্রমমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুশ্রম প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সংস্থা–সকলের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

শারমিন ইসলাম: প্রাবন্ধিক

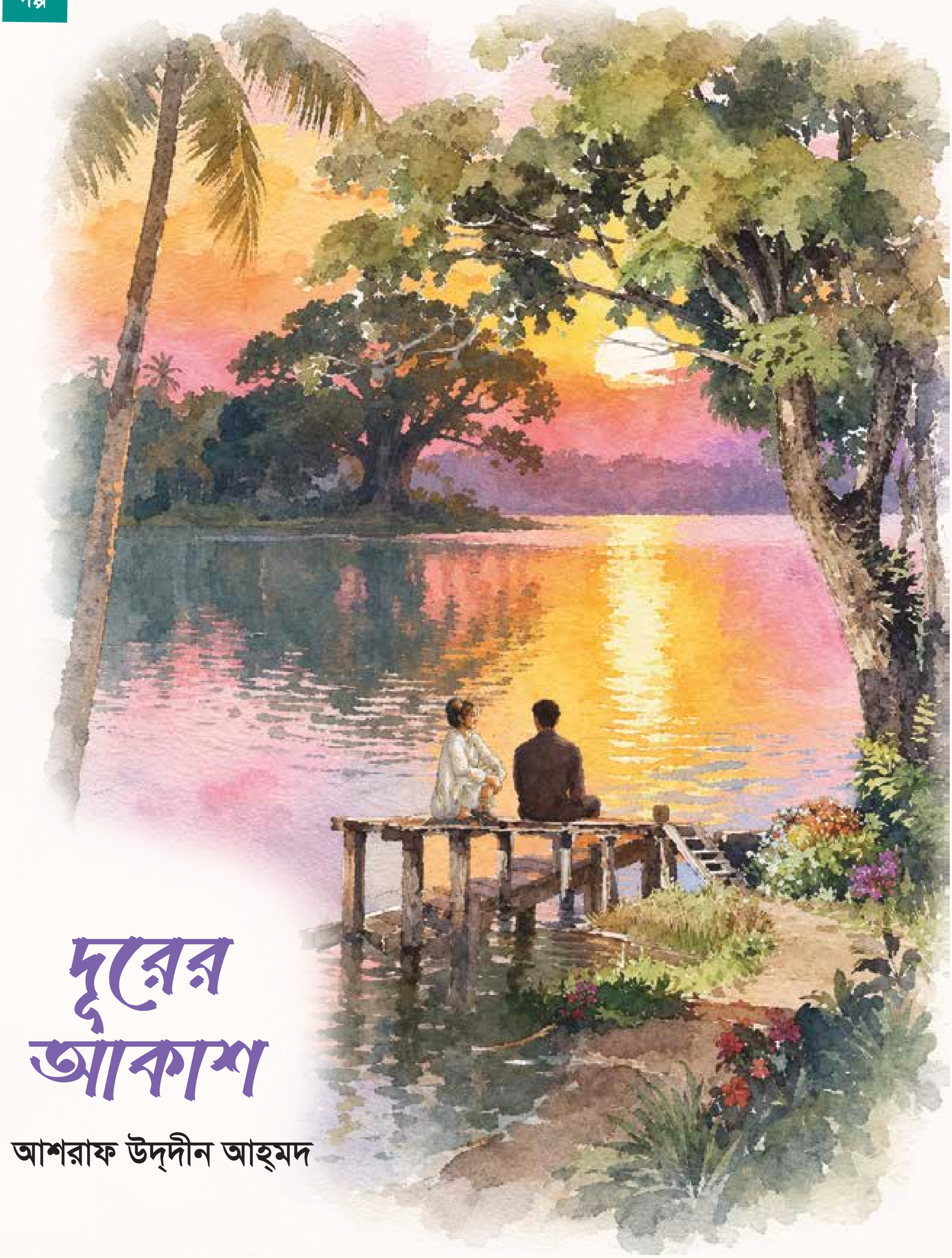

দূরের আকাশ

আশরাফ উদ্‌দীন আহ্‌মদ

যৎকিঞ্চিৎ সাংসারিক বিষয়াদি নিয়ে খিটিমিটি চলছে কয়েক মাস ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। পা থেকে গণ্ডদেশ অবধি জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, তারপরও কোনো প্রতিবাদ করেনি। গতানুগতিক নিছক এই হম্বিতম্বি কবে নাগাদ সংসার থেকে উচ্ছেদ হবে, সে চিন্তায়

জাকির পেরেসানে এখন। শুধু কি পেরেসান, আর কত যে নাস্তানাবুদ হতে হবে আল্লাহ মালুম। চিন্তাশক্তিও দোদুল্যমান হয়ে যাচ্ছে তার। অথৈয়ের নিক্ষিপ্ত খিস্তি-খেউর এই ক'মাস গণ্ডমূর্খের মতো শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আর কত অবজ্ঞা! দৃশ্যপট পরিবর্তন হবার কোনো সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না, যদি না সে দূরগামী সিদ্ধান্ত না নেয়। নিখুঁত এই ভাবনা তাকে অহর্নিশ তাড়িয়ে বেড়ায়। নিজের অবয়বে নিজেই যেন মূর্ছিত হয়। কদাচিৎ নিজেকে একটা নিস্তেজ পাথরমূর্তি মনে হয় আজকাল। অথবা শামুক, নিজেকে শামুক ভাবতে ভালোই লাগে কখনো-সখনো। কিন্তু একটা সুরাহা হওয়াটাও প্রয়োজন।

অনেক ভেবেচিন্তে যখন কোনো কূলকিনারা ঠাঁওর করতে পারে না, টানটান উত্তেজনায় নিজেই সংকুচিত হয়ে যায়। ঠিক তখনই দক্ষ কুশীলবের মতো অথৈয়ের সামনাসামনি এসে জানায়, তোমার জয় অনিবার্য। মুহূর্তে তামাম রাগ-বিদ্বেষ-মন কষাকষি প্রেমাসক্তে রূপান্তরিত হয়। লম্বালম্বি একটা সূক্ষ্ম ছায়া এসে জাকিরের শরীরের ওপর লেপ্টে যায়। তোলপাড় বুকের ভেতরের সমস্ত ভালোবাসায় এক নিমিষে সাত সমুদ্র তেরো নদী হয়ে ভেসে যেতে থাকে ওরা দুজন মানব-মানবী। ওরা দুজন মানেই দুজন, আর কেউ নয়।

যৎসামান্য পৈতৃক বিষয়-আশয়ের প্রতি কখনো জাকিরের দৃষ্টি ছিল না, গ্রামকে সে গ্রামের জায়গায় রেখেছিল। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর নিজ গ্রাম ছেড়ে এসেছে গোবেচারা একজন জাকির। এত বছর আর ও মুখো হয়নি, যাওয়ারও কোনো প্রয়োজন মনে করেনি। গ্রামে রয়েছে চাচা এবং তার ছেলেমেয়েরা। কোনোদিন যাওয়ার ইচ্ছেও মনের মধ্যে দানা বাঁধেনি। কে আর যায় অমন অজপাড়াগাঁয় দামি জুতো ক্ষয় করে। তাছাড়া কত ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়। মনে মনে যদিও অনেকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে একবার অন্তত বাপ-মায়ের কবরটা দেখিয়ে আনবে অথৈকে। কিন্তু এমন চোখে তাকায় যে সব কথা তালগোল পাকিয়ে যায়। তখন সে শামুক হয়ে যায়। নিজের খোলসে নিজেই অদ্বিতীয়।

অথচ কী বাস্তব পরিণতি! আজ তাকে সেই পুরানো গন্তব্যে প্রত্যাবর্তন করতে হচ্ছে। অথৈয়ের খোঁচাখুঁচি আর অকথ্য ভাষার খিস্তি-খেউরে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। গেঁয়ো স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়া ঝাঁমা ইট বসানো সরু রাস্তা ধরে নিচের দিকে পায়ে পায়ে লাগেজ হাতে নামতে থাকে। শহুরে একজন মানুষ জাকির হোসেন। যার শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এখনো লেপ্টে মাটির সোঁদা গন্ধ। বুকের মধ্যে নদী আর মাটির কেমন কেমন গন্ধ। বুক ভরে শ্বাস নিতেও ভারি ভালো লাগে। কত কালের পরিচিত মাটির কাছাকাছি এক মানুষ এসে গেছে। ঘাসের ডগায় শিশিরের কোমল বিন্দু এখনো লেগে আছে। পায়ের স্পর্শে ভেঙে যায় লকলকে ঘাসের ডগা। মন ভরে দেখতে সাধ জাগে, কত কাল পরে ফিরে আসা, কত শতাব্দী হবে যেন! মুহূর্তে মন ভালো হয়ে যায়। কত পরিবর্তন চোখে পড়ে, সবাই কত তাড়াতাড়ি কত বড়ো হয়ে গেছে, মানুষজনের চোখের ভাষা, হাঁটার ধরন, শরীরের গড়নে কত পরিবর্তন, কেউই আর কারো চেয়ে কম নয় যেন। সময়ের তালে মানুষও বেগবান।

বাড়িতে পৌঁছালে চাচা-চাচি, ভাইবোনেরা জেঁকে ধরে। অনেক বয়স হয়েছে চাচার। চাচিও কেমন বুড়ি হয়ে গেছে। ছেলেরা সব যে যার সংসার নিয়ে আছে। চাচাতো বোনটা বিধবা, তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের গলায় ঝুলছে। বাড়ির অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ে, বিশেষ করে উত্তর দিকের ফাঁকা জমিটুকু এখন গরু রাখার গোয়াল। ওদিকে দুটো ঘরও তুলেছে। সংসারে সদস্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের প্রয়োজন পড়ে, তখন মাটিতে টান পড়ে, বাড়িঘর ওঠে। জাকির সবই লক্ষ করে। কিছু ভালো লাগে আবার কিছু ভালো লাগে না তেমন। চাচা-চাচির শারীরিক অবস্থা যেমন, অর্থনৈতিক অবস্থাও তেমনি! পলেস্তারা ক্ষয়ে ঝরেঝরে দেওয়ালের মতো অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। জাকির বুঝতে পারে না এ সময় তার কী বা করার আছে? অথবা কী করা দরকার। নিজের কাছে ফিরে আসার একটা আনন্দসুখ অনুভূত হয়। কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ সব। নাগরিক ঘেরাটোপের বাইরে অন্য একটা জগৎ, যা শুধু তার একান্ত আপনার।

পরেরদিন কাক ডাকা সাত সকালে বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত করে। পারিবারিক গোরস্তান। এখানে সবাই আত্মীয়। ছায়া ঢাকা মায়া ভরা গ্রামের এই দৃশ্য দেখে জাকির নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। চোখের মধ্যে কত দৃশ্যপট সেলুলয়েডের ফিতের মতো চলে আসছে। ছোটোবেলার সেই পুরানো পুকুর ঘাটের পায়ে চলা সরু পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কত কথাই না মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি করতে থাকে। চাচা সঙ্গে ছিলেন, চাচা বারংবার পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে জাকির মন্থর গতিতে হাঁটে। একটা সময় বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে মণ্ডলদের দিঘিটার কাছাকাছি আসে। বাঁশের বাঁকারির মাচায় বসে দুজন। দিঘির কাকচক্ষু টলটলে পানিতে আকাশের প্রতিবিম্ব দেখে উৎফুল্ল হয়। মণ্ডলরা শরিকে-শরিকে কাইজা-ফ্যাসাদ করে যে এখনো মরছে, সে কথা শুনে জাকির মনে আঘাত পায়। বাল্যকালে মণ্ডলবাড়ির সাথে তার একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ও বাড়ির এক মেয়ে, যার নাম ফুলেশ্বরী, এক সঙ্গেই তো বড়ো হয়েছিল। ভালোবাসার বীজ রোপণ হতে না হতেই একদিন হঠাৎ বিয়ে হয় ওর। কোথায় কোন গাঁয়ে চলে যায় কার বাড়ির বউ হয়ে, তারপর আর কোনো খোঁজ নেওয়া হয়নি। জাকির তখন শহরে চলে আসে পড়তে। ভুলে যায় পেছনের সমস্ত স্মৃতি। কখনো গাঁয়ে গেলে মণ্ডলবাড়ির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকত। দিঘিটার কাছাকাছি এসে বসত, তারপর আবার শহর- লেখাপড়া। সব ভুলে যেত, পেছনে থেকে যেত তাবৎ রাশি রাশি স্মৃতি! অনেক বছর পরে, তখন

লেখাপড়া শেষ করে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে, শহরে পাকাপোক্ত একটা আসন হয়ে যাবে এমন একটা আশা মনে আশ্রয় নিয়ে ফেলেছে, এ সময় গ্রামে গিয়ে শোনে ফুলেশ্বরী বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে, বাঁজা-অপয়া বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরত দিয়ে গেছে। তারপর আরো অনেক সময় কেটে গেছে। বিয়েশাদি-সন্তান সবই হয়ে গেছে জাকিরের। গ্রামের লোক মারফত একদিন শোনে ফুলেশ্বরী আর নেই। বাড়ির কাছের দিঘিটায় হতভাগী ডুবে মরেছে। হয়ত সেকারণে দিঘির পানি এতখানি স্বচ্ছ, কাকচক্ষু রূপে জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব। জাকির এ সময় চাচাকে কিছুই আর বলে না। একটা কষ্ট বুক ঠেলে বের হয়ে এলেও নিজেকে সংবরণ করে। সবুজ বৃক্ষরাজি ছেয়ে রেখেছে দিঘিটাকে। কাছাকাছি ঘুঘু ডেকে যায়। দূরে কোথাও কোকিলও ডাকছে থেমে থেমে। কত কথা মনে এলেও কিছুই বলতে পারে না মুখে। কী দরকার আছে মুখে বলার। সবই কেমন সূক্ষ্ম ছবি, একটা টোকা দিলে যদি ভেঙে যায় খান খান হয়ে। থাক তবে যেমন আছে, কী দরকার ফালতু কথার। অনেকটা সময় কেটে যায়। কেউ কথা বলেনি। কথা যেন প্রকৃতির শোভা হয়ে ভেসে গেছে... এ অপরূপ দৃশ্য দেখে কে আর জীবনের কথা ভাবে, নাগরিক সভ্যতার কথা ভাবে। মন ভালো হয়ে যাওয়া হিমেল সমীরণ মনকে দোলা দেয়, কিসের দোলা বোঝে না। বুক ভরে বিশুদ্ধ শ্বাস নেয়, কত নির্মল আর সতেজ। ঘাসের গন্ধ আর মাটির সোঁদা গন্ধ মিলেমিশে একাকার। সময়ের ঘড়ি চলমান। একসময় জাকির বলে ফেলে, চাচা দরকারি কিছু কথা ছিল, কিন্তু কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না...

–সংকোচ করছ কেন, বলো বাবা...

–না মানে, আমি তো ঢাকায় ভাড়া বাড়িতেই থাকি, আপনি জানেন।

চাচা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, কেন জানব না। তুমি চিঠিতে অনেকবারই বলেছ...

–হ্যাঁ, স্মরণ আছে তাহলে!

–না বাবা, ভুলে যাবো কেন, বয়স হলেও স্মৃতিশক্তি নষ্ট এখনো হয়নি।

জাকির আবার একটু কী ভাবে, তারপর বলে, চাচা সমস্যা হলো আপনার বউমাকে নিয়ে...

অকস্মাৎ চাচা জানতে চাইল, কী হলো বউমার...

–না মানে আপনার বউমা ভাড়াবাড়িতে থাকতে চায় না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চাচা বলে উঠল, ঠিকই তো, ভাড়াবাড়িতে থাকাটা আমিও পছন্দ করি না।

–কিন্তু চাচা, নিজের বাড়িঘর করতে...

–পয়সাকড়ি তো খরচা করতেই হবে বাবা!

আবার একটু ভাবনা যেন মাথায় উঠে এলো, কী বলবে তারপর। কিন্তু না, অত ভেবে কাজ নেই, জাকির সোজাসাপটা বলে ফেলল, তাই তো আপনার বউমা একপ্রকার জোর করেই আপনার কাছে পাঠালো।

চাচা যেন একটা দ্বিধায় পড়ে গেল, না মানে বুঝলাম না তো বাবা! আমি কী করতে...

–আব্বার জমিজমার ভাগ তো আমি...

জাকির লক্ষ করে অকস্মাৎ চাচার মুখটা কেমন কালো বর্ণের হয়ে গেল। আর কিছু কি বলা দরকার কি না, বুঝতে না পারলেও জাকির আবার জানায়, আমি বড়ো অসুবিধায় পড়ে এসেছি চাচা, যদি আমার ভাগটা...

একটু সময় নিয়ে চাচা বলল, তোমার আব্বা মানে বড়ো ভাইজান তো শেষজীবনে অনেক ধারদেনা করেছিল, তা তো জানো কিছু!

–হ্যাঁ, মা বলেছিলেন মৃত্যুর আগে।

–সে ধারদেনা কিন্তু অনেক ছিল...

–তারপরও।

–বড়ো ভাইজান হঠাৎ চলে গেলেন। জমিজমা বিক্রি করে তোমাদের দুভায়ের মানুষ করার দেনা পরিশোধ করেছিলেন। তোমার বড়ো ভাইটিও তো বিদেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

–কিন্তু চাচা জমি তো অনেক ছিল শুনেছি। দাদার সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারার কিছুই হয়নি। তো সেগুলো এখন কী অবস্থায় আছে।

–তুমি তো খোঁজখবর কিছুই রাখোনি। এখন টাকার প্রয়োজনে ছুটে এসেছ, ভাবছ অনেক আছে, গ্রামে গেলেই পেয়ে যাবে।

–ভাগ-বাঁটোয়ারা কবে হলো, আম্মা তো কিছু...

–ভাবি জানবে কী করে? বড়ো ভাইজান চলে যাওয়ার আগে ভাবি তোমাদের সংসারে চলে গেলেন, শহরে থাকবে বলে।

–না, এভাবে বলছেন কেন, আমাদের দেখাশুনা করবার জন্য আব্বাই তো...যাক জমিজমার তাহলে এখন কী অবস্থা?

–তোমার বাপের ভাগের যা ছিল সবই বিক্রি করে দিয়েছে, আর যেটুকু অবশিষ্ট তাও ঐ স্কুলের আঙিনার জন্য দান বাবদ লিখে দিয়েছে...

–আমি তো শুনেছিলাম!

—চিলে কান নিয়ে গেছে বলে চিলের পেছনে না ছুটে কানে হাত দিয়ে দেখ। হাতি-ঘোড়া তেমন কিছুই ছিল না আমার আব্বাজানের মানে তোমার দাদার। বড়ো ভাইজান তো তোমাদের দুভায়ের পেছনেই ঢেলেছেন। শেষ জীবনে এই বসতবাড়ির ভাগটুকু আমার নামে দলিল-দস্তাবেজ করে গিয়েছিলেন।

জাকির হোসেন আর কোনো কথা বলতে পারে না। নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে হলো। অথৈয়ের জেদের কারণে এতকাল পরে গাঁয়ে এসে কী অপদস্থ হতে হলো। ওর কথা আর ভাড়াবাড়ি নয়, একটা প্লট নয় তো ফ্ল্যাটের ইউনিট কিনে মালিক হতে চায়। ভাড়াবাড়ির কলঙ্ক থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ওর কাছে। ছেলেমেয়েদের জন্য স্বাধীন একটা আশ্রয় কে না কামনা করে। জাকিরও তো মনে মনে চেয়েছিল যদি সম্ভব হয় তো মন্দ কী! কিন্তু বাস্তব যে এতটা নির্মম ভাবতেই শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঢাকায় একটা আশ্রয় একটা ছোট্ট নীড় নিজের করে কে না পেতে চায়। অথৈও চেয়েছিল কিন্তু জাকির দিতে পারবে না। তার সে ক্ষমতা নেই। সাধ্যের বাইরে দাঁড়িয়ে কেরানি জীবনে একটা ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের ইউনিট স্বপ্নের মতো হলেও অনেক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মাটির কাছাকাছি। পৈতৃক ভাগের অংশ বুঝে নিতে কিন্তু বাস্তব বড়ো কঠিন ও নির্মম। থামতে হয়, যেখানে থামার কথা নয়, অথবা থামতে হয় সেখানেই। জাকির আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। কিছু আর প্রশ্ন নেই। যার উত্তর খুঁজে পাবে। কিন্তু তারপরও একটা জিজ্ঞাসা মনটাকে বড়ো এলোমেলো করে তোলে। সত্যিই কি তার আব্বা মৃত্যুর আগে ধারদেনা পরিশোধ করবার জন্য সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি বেচা-বিক্রি করে গেছেন! কোথায় যেন একটা দ্বিধা, কঠিন বাস্তবতা সম্মুখে দণ্ডায়মান। মানুষকে চেনা এতটা কঠিন কখনো ভাবেনি। জাকির করুণ চোখে একটা লেজ ঝোলা ফিঙে পাখির দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন সামনে-পেছনে আর কোনো সাঁকো নেই। কোথায় দাঁড়াবে। দূরে কোথাও কোনো গাছের ডালে বসে একটা কোকিল কুহু কুহু ডাকছে। ওর ডাক শুনে ঘরে ফিরে যেতে সাধ হলেও তার তো কোনো ঘর নেই। মাথার ওপরে ছাদ নেই। একটা আচ্ছাদন বড়ো প্রয়োজন। কিন্তু সে ভূমিহীন এক কৃষক, সারাজীবন পরের জমিতে লাঙল ফলা দিয়ে চাষাবাদ করেই গেল, ফসল যা পেল সবটা কি নিজের নাকি আধাআধি, তাও তো জানা হলো না। শুধু প্রতীক্ষায় দিন গোনা। ভাষাহীন চোখ-শরীরজুড়ে আঁধারের কারুকাজ। কোথায় দাঁড়াবে এখন। অথৈয়ের মুখোমুখি কোন মুখে দাঁড়াবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় একজন ছাপোষা মানুষ। বুকের ভেতরের কষ্টকে কে আর সকালের রোদে দানাপানি খেতে দেবে। কষ্ট সে তো কষ্ট। সীমাহীন সমুদ্রের মতো কষ্ট। খুউব ইচ্ছে করে কাঁদতে, মনটাকে হালকা করতে, কতদিন বুক উজাড় করে কাঁদেনি। কান্নাও যেন পাথর এখন।

দুপুরের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনটা ধরতে পারলে বিকেলেই ঢাকা ঢুকে যাবে। সপ্তাহের বাজারটা করা যাবে ধীরে সুস্থে, অথৈয়ের বাজারের ফর্দ তো মুখস্ত। সময় বেশি নেই। রোদটা বেশ কড়া আজ। আশ্বিন-কার্তিক মাসের রোদ এমনই হয়। কখনো মিঠে আবার কখনো অতি কড়া। জাকির আর কিছু ভাবতে চায় না। ভাবনাগুলো উজার হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে-মহানগরে পাড়ি জমায়। তার ক্ষতি কী, বুক ভরে শ্বাস নিতে ইচ্ছে করলেও, দেখে কোথা থেকে একটা প্রজাপতি উড়ে এসে বুকের উপর বসে। কোমল হাতে প্রজাপতিটাকে ধরে উড়িয়ে দেয় এক সময় সে।

ট্রেন ছুটে যাচ্ছে তার গন্তব্যে। জানালার পাশে বসে জাকির বাইরের দৃশ্য উপভোগ করে। সবুজ মাঠের সঙ্গে আকাশের সে কী মিতালি! আকাশ মাটির সঙ্গে, দেখতে দেখতে জাকির স্বপ্নের আঙিনায় হারিয়ে যায়। কিন্তু মুহূর্তে স্বপ্নটা ভেঙে যায়। অথৈ এসে টালমাটাল নৌকায় কুড়ালের আঘাত দেয়। সঙ্গে সঙ্গে নৌকার তলা ফুটো হয়ে যায়। পানি উঠে নৌকা ডুবে যায় মহাসাগরে। মুহূর্তে সমস্ত স্বপ্ন-কল্পনা-কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়। জাকির নিজেকে খুঁজে ফেরে কূলহীন সৈকতে। যে সৈকতে পৃথিবীর কেউ আগে আসেনি, আসলে তাদের অস্তিত্ব হয়ত কেউই তেমনভাবে পায়নি। ট্রেনটা চলছে, তার চলার বিরাম নেই।

আষাঢ়ের আবাহন

বদরুল হক

আষাঢ়ের বরিষন ঝরো ঝরো ঝরে,
কালিমাখা গগনেতে মেঘ করে খেলা;
কর্মে আসে স্থবিরতা কুঁড়ে কাটে বেলা,
নদীনালা খালবিল, জলেতে ভরে।
অবিরাম গুরু গুরু কাঁপে থর-থরে,
নীরবতা নেমে আসে কোথা নেই মেলা;
জলের স্রোতেতে ভাসে গ্রাম-গঞ্জ-জেলা,
গরিবের অন্ন চিন্তা চাল নেই ঘরে।

জলরাশি নেমে গেলে মাটি পায় প্রাণ,
গাছে গাছে ফুটে ফুল, কদম-হিজল;
কামিনী ছড়ায় তার অনুপম বাস।
সোনালি ফসল ফলে ক্ষেত ভরা ধান,
চারদিকে দেখা যায় রকমারি ফল;
প্রকৃতির লীলাখেলা, চলে বারো মাস।

প্রকৃতির উদার দান

মো. আনাস রহমান

মাটির গভীরে শিকড় তোমার, আকাশে মেলো ডানা,
সবুজ পাতার ছায়ায় জুড়ায় পথিক অচেনা।
রৌদ্রদাহে নিজে পুড়ে, দাও যে শীতল ছায়া,
তোমার বুকে জড়িয়ে আছে অবুঝ প্রকৃতির মায়া।
পাখির বাসা ডালপালাতে, গায় যে মধুর গান,
ঝড়-বাদলে আগলে রাখো, বাঁচাও সবার প্রাণ।
ফুল ফুটিয়ে ফল বিলিয়ে ধন্য করো ধরা,
তোমার ছায়ায় ক্লান্তি ভোলে জগত জরা-মরা।
কাঠবেড়ালি খেলায় মেতে তোমার ডালে চড়ে।
সবুজ চাদর বিছিয়ে রাখো গাঁয়ের ঘরে ঘরে।
অক্সিজেন বিলিয়ে দাও অকাতরে রোজ,
তোমার মতো বন্ধু কে যার রাখেনি কেউ খোঁজ।
ঝিরিঝিরি হাওয়া এলে পাতারা দেয় তালি,
তোমার রূপের সুধায় ভরে বনের খালি থালি।
বর্ষা এলে নতুন সাজে সেজে উঠো তুমি
ধন্য তোমার অবদানে আমাদের এই ভূমি।
যুগের পর যুগ ধরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ একা
তোমার মতন উদার আর যায় না কোথাও দেখা।

মেঘের খামে তোমার নাম

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

সজল আষাঢ়ে যখন চঞ্চলা তটিনী
উন্মত্ত ঐ পারাপারে সঁপে মনপ্রাণ,
মেঘের পালক ছুঁয়ে বিরহী রজনী
বুকের পিঞ্জরে গায় মিলনের গান।
কদম ফুলের ছায়ে মায়াবী যে আলো
শ্রাবণের নীল মেঘে আঁকে যে আল্পনা,
সে রূপ দেখিয়া হিয়া বেসেছিল ভালো
স্মৃতির কাঁচপোকাটি করে যে জল্পনা।
বাদলের জলকণা ঝরে অবিরাম
অশ্রুর নূপুর পায়ে আসে প্রিয়মুখ,
বেদনার খামে লেখা প্রেমিকের নাম
বুকের পাজরে খোঁজে হারানো সে সুখ।
মেঘের ডমরু বাজে গহন গগনে,
এ হৃদয় ভিজে ওঠে তোমারি স্মরণে।

ষড়ঋতুর বর্ষাকাল

এ কে এম মোস্তফা

ধূসর মেঘে পূর্ণ আকাশ
যায় না দেখা সূর্যটারে
বৃষ্টি পড়ে ঝম ঝমিয়ে
অঝোর ধারায় মুষলধারে।

মাথাল পরে গাঁয়ের চাষি
লাঙল দিয়ে জমি চষে
কাকভেজা দেয় পাখিগুলো
গাছের ডালে বসে বসে।

আকাশভাঙা বৃষ্টি পড়ায়
সব জলাশয় যায় যে ভরে
ব্যাঙগুলো তাই মহানন্দে
কোরাস গায় আর ফুর্তি করে।

কলাপাতা মাথায় দিয়ে
গরু নিয়ে রাখাল ছোটে
কদম-বেলি গন্ধ ছড়ায়
যদিও তা রাত্রে ফোটে।

আষাঢ়-শ্রাবণ দুইটি মাসে
প্রকৃতির হয় এমন হাল
এটাই হলো বাংলাদেশের
ষড়ঋতুর বর্ষাকাল।

ট্রেনের হুইসেল

সাঈদ বারী

শহরের প্রাচীন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি ধূসর সকাল,
বৃষ্টির গন্ধে ভিজে আছে বিজ্ঞাপন বোর্ড,
তুমি যেন কোথাও দূরে, রেললাইনের বাঁকে,
খুব ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছো বাষ্পের কুয়াশায়।

ট্রেনের হুইসেল–
এই অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাসে জেগে ওঠে
নদীর পারে ঘুমন্ত বাঁশঝাড়,
শুকনো পাতার ভেতর কেঁপে ওঠে
শীতের কাক।
আমি ভাবি, কতজন অচেনা মানুষ
তাদের নিজস্ব প্রস্থান নিয়ে হাঁটছে–
যেন প্রত্যেকের বুকেই লুকানো আছে একটি অপ্রকাশিত স্টেশন।

পেছনের শেষ বগি চলে গেলে
রেলের গায়ে লেগে থাকে কেবল ধাতব উষ্ণতা,
আর আমি একা দাঁড়িয়ে শুনি–
দূরের হুইসেলের ভেতর
তোমার চলে যাওয়ার শেষ প্রতিধ্বনি।

বাবা আমার

ফরিদ সাইদ

বাবা আমার মুক্ত আকাশ
নির্ভরতার চাদর
জীবনজুড়ে আপন মনে
করেন শুধু আদর।

বাবার হাতে হাতটি ধরে
হাঁটাহাঁটি শেখা
বাবার কাঁধে-কোলে চড়ে
এই পৃথিবী দেখা।

লেখাপড়ার হাতেখড়ি
বাবার কাছে শুরু
সারাজীবন বাবা আমার
আসল শিক্ষাগুরু।

ন্যায়ের পথের জ্ঞানের আলো
বিপদকালের ছায়া
বাবা আমার আদর-শাসন
নিখাদ মনের মায়া।

বুকের মধ্যখানে

বিভাস গুহ

কী অপরূপ মায়ায় ভরা
চাঁদের মতো মুখ
দেখলে মনে পাই যে অপার
শান্তি এবং সুখ।

আঁধার ঘরে জ্বলে আলো
ফুটলে মুখে হাসি
বাগানজুড়ে সুবাস ছড়ায়
গোলাপ রাশি রাশি।

স্নিগ্ধতারই পরশমাখা
মুখের সুধা বুলি
রঙিন সুখে দেয় ভরিয়ে
প্রতিটি দিনগুলি।

রোজ পাড়াত ঘুম দুচোখে
ঘুমপাড়ানি গানে
মাগো তুমি আছ আমার
বুকের মধ্যখানে।

সমাপতনের নির্মম সৌন্দর্য

অদ্বৈত মারুত

যা ঘটনা ঘটল, তা যেন একদিনের ভেতর গুঁজে রাখা বহুদিনের জীবন। কখনও মনে হয়, ঐ দিনটা আসলে একটা দিন ছিল না, ছিল একটার ভেতরে অনেকগুলো দিন, অনেকগুলো ভয়, অনেকগুলো প্রায়-মৃত্যু আর শেষে ফিরে আসার এক অদ্ভুত শান্তি।

বিকেল পাঁচটার একটু পর। অফিসে বসে আছি, কিন্তু বসে থাকাটা যেন বসে থাকা নয়– যেন দৌড়াচ্ছি, ভেতরে ভেতরে হাঁপাচ্ছি। বিশেষ সংখ্যার শেষ কিস্তি– এই একটা শব্দই যথেষ্ট ছিল পুরো অফিসকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার জন্য। সময় তখন ঘড়ির কাঁটা নয়, যেন ধারালো ব্লেড– এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হলেই কেটে যাবে সব হিসাব।

প্রেসম্যানের তাড়া যেন কামানের শব্দের মতো বার বার এসে আঘাত করছে। কম্পিউটার অপারেটর বার বার তাকাচ্ছে– তার চোখে আতঙ্ক, যেন সে জানে আজকের রাতটা তার জন্য ভালো কিছু নিয়ে আসছে না।

উপসম্পাদক এসে দুবার ঘুরে গেছেন। আশপাশে সবাই আছে, কিন্তু কেউ কথা বলছে না। সবাই যেন নিঃশব্দ এক চাপের মধ্যে আটকে।

আমি তখন শব্দের ভেতরে ঢুকে আছি। প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি দাড়ি, কমা, সেমিকোলন– যেন অস্ত্রোপচার। ভুল হলে মৃত্যু, ঠিক হলে বাঁচা।

ঠিক তখনই ফোন।

রিংটোনটা এমন কানে বিঁধল, যেন কেউ নিস্তব্ধতার বুক চিরে ছুরি চালাল।

ধরতেই মাহমুদ– ‘দোস্ত, আমি কেরানীগঞ্জে... সদরঘাট আসছি... তুই আধা ঘণ্টার মধ্যে আয়... না হলে...’

কথাটা শেষ করল না। কিন্তু অসম্পূর্ণ কথার ভয়টাই সবচেয়ে বড়ো।

তবু আমি গুরুত্ব দিলাম না। কারণ তখন আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো সত্য ছিল– সময়ের অভাব।

বললাম, ‘অফিসে আছি, খুব ব্যস্ত’, তারপর ফোনটা প্রায় ছুড়ে রেখে দিলাম।

কিন্তু কিছু কিছু ফোন থাকে যেগুলো কেটে দিলেও শেষ হয় না। ওগুলো মাথার ভেতর বাজতে থাকে সারাক্ষণ।

কাজে ডুবে গেলাম আবার। কিন্তু এবার শব্দগুলো আর আগের মতো ধরা দিচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, কোথাও কিছু একটা ফসকে যাচ্ছে।

সাড়ে ছয়টা বাজতে না বাজতেই কাজ শেষ করলাম। শরীর তখন ক্লান্ত, কিন্তু মন অস্থির, যেন কেউ ভেতর থেকে টানছে। তাই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাসে গেলে দেরি হবে। তাই বাইক নিলাম।

রাস্তা তখন সন্ধ্যার আলোয় ডুবে গেছে। দোকানের সাইনবোর্ডগুলো জ্বলছে, যেন শহরের হাজারো চোখ। মানুষের ভিড়, কিন্তু আমি একা।

ফোন দিলাম মাহমুদকে।

বন্ধ।

আবার দিলাম।

বন্ধ।

এবার বুকের ভেতর একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল।

সাড়ে সাতটার দিকে সদরঘাটে পৌঁছালাম।

সদরঘাট এক অদ্ভুত জায়গা। এখানে জীবন আর বিদায়ের গন্ধ মিশে থাকে। লঞ্চের হুইসেল যেন দূরের কোনো আহ্বান। নদীর পানি কালো, গভীর, নিঃশব্দ। মনে হলো, এই জায়গাটা মানুষকে গিলে খেতেও পারে।

ফোন দিলাম আবার।

রিসিভ হলো, কিন্তু কোনো শব্দ নেই।

—আমি বলছি, 'হ্যালো! হ্যালো...!'

ওপাশে নিস্তব্ধতা।

যেন ফোনের ওপারে কেউ নেই, শুধু এক শূন্যতা।

বার বার একই ঘটনা।

এবার মনে হলো কিছু একটা ঘটেছে।

রাত আটটা।

মাহমুদ নেই। শরীর তখন ভেঙে পড়ছে। সারাদিন না খাওয়া, টেনশন– সব মিলিয়ে মাথা যেন বিস্ফোরণের অপেক্ষায়।

পেট খালি, ঠেলে বমি আসছে।

ঠিক তখনই ফোন–

—'মিডফোর্ট হাসপাতালে আসুন... রোগীর অবস্থা ভালো না...'

এই কথাটা শুনে মনে হলো, আমার ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল।

আমি কে, কোথায়– সব ভুলে গিয়ে রিকশায় উঠে বসলাম।

গলিগুলো তখন যেন গোলকধাঁধা।

রিকশা ছুটছে– আমি দুলছি।

বাতাস লাগছে, কিন্তু আরাম পাচ্ছি না। এ যেন বাস্তবতার সঙ্গে একটা শেষ সংযোগ।

হঠাৎ একটা বিকট শব্দ। তারপর অন্ধকার।

চোখ খুলতেই সাদা আলো। হাসপাতালের গন্ধ, ওষুধ, রক্ত, জীবাণুনাশক– সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত বাস্তবতা।

শরীর যেন নিজের নয়।

হাত ব্যথা করছে– পরে বুঝলাম ভেঙেছে।

পায়ে আঘাত। চোখের নিচে কেটে গেছে।

কিন্তু এসবের চেয়েও বড়ো একটা প্রশ্ন–

মাহমুদ কোথায়?

ফোন বের করলাম। বাসা থেকে অসংখ্য মিসড কল। কল ব্যাক করতেই মেয়ের কান্না–

—'বাবা! তুমি কোথায়?'

এই একটা ডাক আমাকে ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দিলো। আমি যেন বুঝলাম– আমি শুধু আমি নই, আমি কারও পৃথিবী।

হাসপাতাল থেকে বেরোলো মাহমুদ। তার চোখে আতঙ্ক জমে আছে, যেন সে এখনও ডুবে যাচ্ছে।

তার কথায় জানা গেল, চাঁদপুর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে। নদীতে ঘোরার শখ– ডিঙি নৌকা। কিন্তু নদী সবসময় খেলা করে না। ফেরার পথে নৌকা ডুবে যায়। এই একটা ঘটনাই সব পাল্টে দিয়েছে।

আমি শুনছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছিল, আমি যেন দূর থেকে শুনছি। সবকিছু যেন স্লো-মোশনে চলছে।

আমি বললাম– 'বাসায় যাব।'

সে কিছু বলল না। শুধু তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গেল ভেতরে, যেন সে এখনও সেই ডুবে যাওয়া নৌকাটার ভেতর আটকে।

রাত প্রায় একটা। বাসার সামনে পুলিশ।

গলির বাতাস ভারী, যেন এখানে একটু আগেই কিছু ভেঙে গেছে।

জানলাম, পাশের ফ্ল্যাটে এক লোক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

আজকের দিনটা যেন শুধু বিপদের জন্যই তৈরি ছিল।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মনে হলো– আমি আর উঠছি না, অন্ধকারের ভেতরে নামছি। একটা অজগর সাপ যেন আমাকে গিলে ফেলছে ধীরে ধীরে। ঠিক তখনই–

—'বাবা!'

ডাকটা যেন বজ্রপাত। আমি থেমে গেলাম।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরলাম।

তার শরীরের উষ্ণতা আমাকে ফিরিয়ে আনল জীবনে।

দরজার সামনে সেই লোকটা।

মাথা নিচু।

তার ছোটো মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে– চোখে প্রশ্ন, ভয়, আর অদ্ভুত এক নির্ভরতা।

লোকটা ধীরে বললেন–

'ক্ষমা করে দেবেন।'

তার কণ্ঠে এমন ভাঙন, যেন সে নিজেকেই ক্ষমা করতে পারছে না।

আমি কিছু বললাম না। কারণ বুঝলাম, কিছু কিছু দুঃখের কোনো ভাষা নেই, ভাষা থাকে না।

ঘরে ঢুকে বারান্দায় দাঁড়ালাম। আকাশে চাঁদ– শান্ত, নিশ্চুপ, সবকিছু দেখছে। তারাগুলো ঝিকমিক করছে, যেন অগণিত ছোটো ছোটো জীবন টিকে আছে।

হঠাৎ পাশের ফ্ল্যাট থেকে হাসির শব্দ। একটু আগেও যেখানে মৃত্যু দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে এখন হাসি।

জীবন এমনই– এক মুহূর্তে ভেঙে পড়ে, আরেক মুহূর্তে গড়ে ওঠে।

আমি চোখ বন্ধ করলাম।

মনে হলো, আজ আমি কয়েকবার মরে গিয়েছিলাম, আবার বেঁচে উঠেছি।

আর এই বেঁচে ওঠাটাই সবচেয়ে বড়ো অলৌকিকতা।

চলে গেলেন স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য অভিনেতা আতাউর রহমান

কনক হোসেন

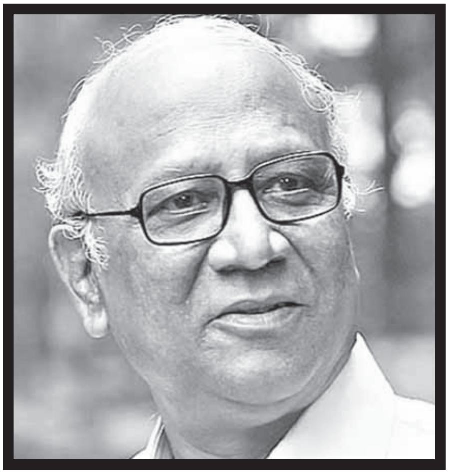

বাংলা নাট্যাঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য অভিনেতা, নাট্যকার এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আতাউর রহমান ৮৪ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১১ই মে দিবাগত রাত ১২টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

আতাউর রহমান ছিলেন মঞ্চ ও টেলিভিশন অভিনেতা, মঞ্চ নির্দেশক এবং লেখক। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-পরবর্তী মঞ্চনাটক আন্দোলনের অগ্রদূত। ১৯৪১ সালের ১৮ই জুন আতাউর রহমান তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমান বাংলাদেশ) নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক। তার মাতাও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। তার মায়ের কাছেই তিনি বাইরের বই পড়ার শিক্ষা লাভ করেন। তার শৈশব কাটে নোয়াখালীতে তার মামার বাড়িতে।

আতাউর রহমান 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়'-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭২ সালে তিনি প্রথম মঞ্চনাটক মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো-এ নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ৩৫টির বেশি মৌলিক এবং অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করা মঞ্চনাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– গ্যালিলিও, বিউরি দ্য ডেড, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, রক্তকরবী, বাংলার মাটি বাংলার জল, নারীগণ, ঈর্ষা, অপেক্ষমাণ এবং ওয়েটিং ফর গোডো।

আতাউর রহমান বাংলাদেশ সেন্টার অব দ্য ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক এবং পরে সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সভাপতি থাকাকালীন ২০১১ সালের মে মাসে ১০ দিনব্যাপী ১ম ঢাকা আন্তর্জাতিক থিয়েটার উৎসবের আয়োজন করেন। তিনি বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনে প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। মঞ্চের পাশাপাশি তিনি কবিতা লিখতেন। তার লেখা কয়েকটি কবিতা হলো– 'স্বপ্নের পাহাড়', 'রাতদিন', 'ভালো আছি'।

মঞ্চনাটকে তার অবদানের জন্য তিনি ২০০১ সালে একুশে পদক এবং ২০২১ সালে সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া তিনি অর্জন করেছেন– শহিদ মুনীর চৌধুরী পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ মঞ্চ নির্দেশনার জন্য চক্রবাক পুরস্কার, মঞ্চ নির্দেশনার জন্য লোক নাট্যদল স্বর্ণ পদক, অন্যদিন ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম পুরস্কার, মঞ্চনাটকে অবদানের জন্য অঁলিয়ো ফ্রঁসোয়া পুরস্কার, চ্যানেল আই রবীন্দ্রমেলা আজীবন সম্মাননা পুরস্কার, কাজী মাহবুবুল্লাহ আজীবন সম্মাননা পুরস্কার, বাংলা একাডেমির ফেলো, আরটিভি স্টার অ্যাওয়ার্ডস আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রভৃতি।

দেশের মঞ্চনাট্যের কিংবদন্তি ও 'মঞ্চসারথি' হিসেবে পরিচিত আতাউর রহমানের মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। ১২ই মে রাজধানীর মগবাজারে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চনাট্যের এ বরেণ্য ব্যক্তিত্বের জানাজায় নাট্যাঙ্গনের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমে থাকা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

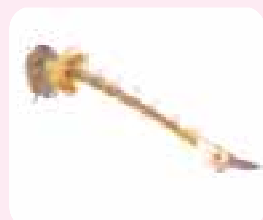

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

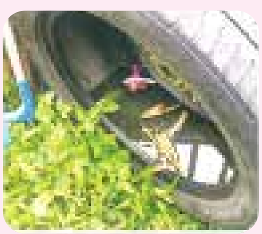

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

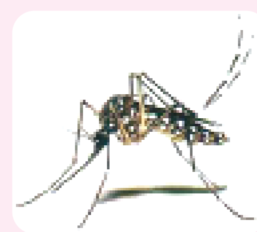

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশ বিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়ঃ

- আপনার ঘরে এবং আশপাশে যে কোনো জায়গায় পানি জমতে না দেওয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারি শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 12, June 2026, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd